গুড প্যারেন্টিং

সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়

নেসার আতিক

গুড প্যারেন্টিং

(সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়)

নেসার আতিক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

মাতা-পিতার সবচেয়ে বড়ো প্রজেক্ট সন্তান। সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে সন্তানের কুসুমাস্তীর্ণ পথ নির্মাণে মা-বাবা ক্লান্তিহীন। বিশ্বায়নের এই সময়টা বেশ বড়ো ধরনের অস্থিরতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একুশ শতকের এই সময়ে এসে সন্তান প্রতিপালনের ধারণা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি আর সামষ্টিক নৈতিকতার অভাববোধের মধ্য দিয়েই সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নির্মাণের চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্বে প্যারেন্টিং ভাবনা তুমুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় প্যারেন্টিং নিয়ে মোটাদাগে কিছু ধারণার উন্মেষ হলেও সেই অর্থে বিস্তারিত বোঝাপড়া নেই। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আমাদের উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার প্রবল স্রোতের মধ্যেও আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনও নৈতিকতা ও আদর্শের চর্চাকারী ব্যক্তি-পরিবার নেহায়েত কম নয়। অনেক খারাপ সংবাদের মাঝেও স্বস্তির কথা এটাই যে, এখনও মুসলিম সমাজ কাঠামোতে পরিবার নামে একটা প্রাণোচ্ছল ব্যবস্থাপনা আছে; যা তথাকথিত আধুনিক সমাজে অনুপস্থিত। আমাদের গর্ব ও অর্জনের এই কাঠামোকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহভাবে জারি রাখা জরুরি।

সেই প্রচেষ্টারই একটা ধাপ; আগামী প্রজন্মের হাতে আলোক মশাল ধরিয়ে দেওয়া এবং অভিভাবকত্বের জায়গা থেকে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের পথরেখা এঁকে দেওয়া। পেশাদার ব্যাংকার জনাব আতিক নেসার তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই অতি প্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে কলম ধরেছেন, লিখেছেন *গুড প্যারেন্টিং : সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়*। বাংলা সাহিত্যে প্যারেন্টিং নিয়ে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর এই পরিবেশনা অভিভাবক মহলে সাড়া জাগাবে বলে বিশ্বাস করছি। লেখক গৎবাঁধা ধারাবাহিক আলোচনায় না গিয়ে একেবারে মৌলিক কথামালায় থাকার চেষ্টা করেছেন।

সম্মানিত লেখক, সম্পাদনা পরিষদ এবং বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক আলোকিত প্রজন্মের প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

দু'কলম কৈফিয়ত

'গুড প্যারেন্টিং' বা সঠিকভাবে আদরের সন্তানদের গড়ে তোলা আজকের সময়ে যেকোনো দায়িত্বশীল মাতা-পিতার জন্য চ্যালেঞ্জিং বিষয়। ঠিক কোন কৌশল কাজে লাগালে সন্তানরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে, তা নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। পশ্চিমা বিশ্বে এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক আগ্রহ থাকলেও আমাদের দেশের পরিবেশে 'গুড প্যারেন্টিং' ধারণা নতুন। আমাদের সমাজের অভিভাবকবৃন্দ সন্তান লালন-পালনে সনাতনি ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত। এখানে সন্তান জন্মদান এবং তাদের পরিণত মানুষে উত্তীর্ণ হওয়াকে প্রাকৃতিক ব্যাপার মনে করা হয়। আরেকটা বদ্ধমূল ধারণা হলো, লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি জোটাতে পারলেই সন্তানের জীবনের মোটামুটি সব চাওয়া-পাওয়া সার্থক হয়ে গেল। এ কথা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তবে সমাজে এত অনাচার, বিকৃতি ও বৈষম্যের ছড়াছড়ি কেন? একটা সময়ে সমাজে মূল্যবোধ প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করে নিত। এখন দিন বদলেছে। প্রযুক্তির বিস্ময়কর উৎকর্ষে পুরো বিশ্ব যে কারও হাতের মুঠোয়। তাই আজকের সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু শুধু তার পরিবারের সদস্য কিংবা দেশের নাগরিকই নয়, সীমানা ছাপিয়ে বিশ্ব গ্রামের (Global Village) স্মার্ট প্রতিনিধিও বটে। এ প্রেক্ষাপটে মানবশিশুর মন ও মননের বিকাশে স্থানিক ও বৈশ্বিক উপাদানের বিস্তর প্রভাব রয়েছে।

সন্দেহ নেই, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির ধারে গত দু-তিন দশকে সমাজের ব্যাপক মেরুকরণ হয়েছে। ব্যক্তির মননে, চিন্তায়, রুচিশীলতায় ও আচরণে এর প্রভাব স্পষ্ট। সেদিক থেকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি খুবই অপ্রতুল। একজন সন্তান, ছাত্র, শিক্ষক, পিতা, স্বামী, পরিবারের সদস্য, কর্মজীবী, সহকর্মী এবং সমাজের অংশীজন হিসেবে নানা মাত্রায় জীবন ও সমাজকে যেভাবে দেখছি বা দেখতে চেয়েছি, সেই লক্ষ্যে দুই মলাটের মাঝখানে কিছু কথা লিখেছি। ক্রমক্ষয়িষ্ণু সমাজের নানা অসংগতি দেখে এ ভাবনায় স্থির হয়েছি যে, সব জটিল সমস্যার সূত্রপাত মূলত পরিবার নামক সংগঠনকে উপেক্ষা করা এবং একে দুর্বল করা থেকে। সুতরাং এর সমাধানও শুরু করতে হবে এই পরিবার থেকেই। আর পরিবার নামক এই সংগঠনের মূল চালক হচ্ছেন মা-বাবা। সামান্য হলেও সমাজের প্রতি নিজের ব্যক্তিগত দায় শোধের তাড়না থেকেই আমার সবিনয় নিবেদন 'গুড প্যারেন্টিং : সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার উপায়'। আমার জীবনসাথি শাহলা ও আদরের কন্যা শাহলীন ও আফরিন তাদের প্রাপ্য সময় আমার জন্য উৎসর্গ না করলে হয়তো লেখালেখিতে আমার মনোযোগ দেওয়া হয়ে উঠত না। বিশেষ করে শাহলা সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝেও সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে আমার পাশে থেকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমার প্রিয় সহকর্মী মাহবুব-ই-খোদা, শাফায়েত হোসাইন ও গাজী আফসানা

অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটির উৎকর্ষ ও নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হুরে জান্নাত অনেক যত্ন করে ও সময় নিয়ে বইটির সম্পাদনায় আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের অবারিত কল্যাণ কামনা করি। এ ছাড়া এই প্রচেষ্টায় অনেক সুধীজনের নিরন্তর উৎসাহ, মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। দেশি-বিদেশি বই, জার্নাল ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের নিবন্ধের সহযোগিতা নিয়েছি। প্রত্যেকের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করছি। প্রকাশনায় অনেক পরে যুক্ত হয়েও ইতোমধ্যে পাঠকের কাছে নতুনধারার সুরুচি ও সুখপাঠ্যের যোগানী হিসেবে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন আত্মপ্রকাশ করেছে। এমন প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিষ্ঠান বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় নিজেকে নির্ভার মনে করছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সমাজে এমন অনেক চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যারা সমাজকে নিয়ে ভাবেন এবং সামনে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের সাথি হয়ে চলার প্রত্যাশায়...

আতিক
১৫ জানুয়ারি, ২০১৯

সূচিপত্র

প্যারেন্টিং ভাবনা	১১
প্যারেন্টিং : বাস্তবতা	১৬
শিশুর বিকাশে দক্ষতা পিরামিড	২০
দক্ষতার নানা দিক : শিক্ষা,ভাষা, বিশ্লেষণ	৩৯
সামাজিক দক্ষতা	৫৯
সন্তান পালনে পারিবারিক প্রস্তুতি	৬৮
প্যারেন্টিং আচরণ	৮০
সন্তানদের বেড়ে উঠায় পারিবারিক বন্ধন	৮৬
সন্তান প্রতিপালনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব	১০৪
সন্তান পালন সাধনার বিষয়	১১৯
প্যারেন্টিং : নিজের আয়নায় আমি	১২৪
ঋণ স্বীকার	১২৭

প্যারেন্টিং ভাবনা

> A science requires methodologies, structures, strategies and assumptions. An art requires wisdom, tact, intuition, love and commonsense.Child rearing is a science, an art, and a spiritual endeavor[১].

বর্তমান সময়ে আমাদের ভাবনার ও প্রচেষ্টার বড়ো অংশ জুড়ে আছে সন্তানদের বেড়ে ওঠা। আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমরা সন্তানদের 'আকাঙ্ক্ষার ধন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। দেখতেই চাই তারা যেন সবকিছু ছাপিয়ে জীবনে অনন্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এই যাত্রায় আমাদের গতানুগতিক স্কুলিং বা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে সমস্যাটা বেশি হয়। কোন পদ্ধতির স্কুলিং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবে, তা আমরা নিশ্চিত নই। কারও ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসায় পাঠালে সন্তান-সন্ততি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। আবার কারও ধারণা মাদ্রাসা শিক্ষার মান ভালো নয়। কেউবা আবার বাংলা মাধ্যমেই পড়াতে চান।
পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার চাহিদাও একেবারে কম নয়। আবার আদৌ শুধু একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বই সন্তানের সত্যিকারের সফলতা কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। সার্বিকভাবে এটা একটা বড়ো প্রশ্ন, আমরা আসলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কীভাবে গড়ে তুলতে চাই?

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সমাজব্যবস্থার প্রভাব

আমরা ছোটোবেলায় 'জীবনের লক্ষ্য' (Aim in life) নিয়ে রচনা লিখেছি। সবাই ডাক্তার, প্রকৌশলী কিংবা আদর্শ সমাজসেবক হতে চেয়েছি। নীতিগতভাবে 'জীবনের লক্ষ্য' নিয়ে আমরা যা লিখেছি ও শিখেছি, তাতে দোষের কিছু নেই। আধুনিক পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে হলে এর বিকল্প চিন্তাও করা যায় না। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে নেই মানা। যার স্বপ্ন যত বড়ো, তার তত বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মুশকিল হলো আমাদের সমাজে লেখাপড়ার সব আয়োজন চাকরিকেন্দ্রিক। জ্ঞানী ও আদর্শ মানুষ হওয়া আমাদের কাছে মুখ্য নয়। উন্নতি যদিও একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়; তবুও বেশি আয়, সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস, সন্তানকে আধুনিক স্কুলে পাঠদান ইত্যাদি বিষয়কে সব সমাজেই বৈষয়িক উন্নতির স্বাভাবিক মাপকাঠি ধরা হয়। এ বাস্তবতায় আমাদের দেশেও এসব মাপকাঠিতেই সফলতা-ব্যর্থতাকে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় সন্তান-সন্ততি যেন পিছিয়ে না পড়ে, এজন্য অবিভাবকগণ সদা উদ্‌বিগ্ন।

---

১. Parent Child Relations, Hisham et el, IIIT, USA

বিশেষ উদ্দেশ্যতাড়িত হলেও এগুলো অপ্রয়োজনীয় বা উপেক্ষণীয়ও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিশু সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে আমরা দুর্নীতির আশ্রয় নিই এবং এ বাবদ যা খরচ হয়, তা বন্ধুমহলে বলে তৃপ্তি বোধ করি। যেন প্রমাণ করতে চাই, অভিভাবক হিসেবে আমি সন্তানের জন্য সর্বোচ্চটুকুই করেছি। অথচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসকাঠামো গঠনের শ্রেষ্ঠ সময়। দুর্নীতির মাধ্যমে যে শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু, তার কাছ থেকে দেশ-জাতি খুব বেশি কিছু কি আশা করতে পারে?

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও শৃঙ্খলা মানতে চাই না। সত্যবাদিতা, সরলতা, উদারতার মতো অসাধারণ গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত না করে ঠগবাজি আর প্রতারণা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। মিথ্যা বলা আর পরচর্চা আমাদের রক্ত-মাংসে মিশে গেছে। পরিবারের বাইরে আমরা কাউকে চিনতে চাই না। রোগীর সেবা করা, তাকে দেখতে যাওয়া যে কত পূণ্যের কাজ, তা আমরা ভুলতেই বসেছি।

বাস্তবতা হলো বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত সিলেবাস, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার শত আয়োজন সত্ত্বেও আমাদের স্বকীয়তা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ বিনয়ী মানুষের বড্ড অভাব আজ সমাজে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নির্মোহ, নিঃস্বার্থ, উদারচিত্ত মানুষ তৈরির পাঠ নেই। সর্বত্র অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, দুর্নীতি এবং মূল্যবোধহীন জীবনযাপন পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। জীবনমাত্রই যেন ভোগের লীলাভূমি। নতুন প্রজন্ম এ আগ্রাসনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ।

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কী

আমাদের পড়াশোনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধনা শুধু টাকা উপার্জন বা বৈষয়িক উন্নতিই নয়। আমাদের পরিচয় আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি এবং আমাদের মূল কাজ সমাজে কল্যাণকর কাজ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য–

> ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো, খারাপ কাজে নিষেধ করো। আর বিশ্বাস করো আল্লাহকে।’[২]

কুরআনে বিনয়ী মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে এভাবে–

> ‘তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কী হতে পারে, যে ভালো কাজ করে, জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।’[৩]

---

২. সূরা আলে ইমরান-১১০।

আমাদের প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হতে হবে জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় করার সাধনা করা। অবিরাম উৎকর্ষ অর্জনের প্রচেষ্টার ফলে আমাদের পরকালীন জীবনও সুন্দর হতে পারে। দুনিয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতাই চূড়ান্ত নয়; পরকালীন সাফল্যই প্রকৃতসাফল্য এবং সেখানে ব্যর্থ হলে দুনিয়ার জীবনও অর্থহীন। আমাদের প্রতিদিনের চাওয়া–

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন।'[৪]

আমাদের বিবেচনায় শিক্ষাপদ্ধতি যাই হোক, শিশুর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় তার পরিবার থেকে। ঘর কেবল প্রাথমিক শিক্ষাস্তরই নয়; বরং শিশুর জন্য আগামী দিনের বিস্তীর্ণ জায়গায় নিজেকে মেলে ধরার প্রস্তুতিপর্বের আদর্শ বিদ্যালয়। পরিবারে শিশুর যথাযথ শিক্ষণের জন্য অভিভাবক হিসেবে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। কুরআনে বলা হয়েছে–

'তুমি নিজেকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো।'[৫]

রাসূল সা. বলেছেন–

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি কাজ ছাড়া সব সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎকর্মশীল সন্তান; যে তাদের জন্য দুআ করে।'[৬]

মহানবি সা.-এর অমীয় বাণীর আলোকে আমরা যেন এমন সৎকর্মশীল সন্তান রেখে যেতে পারি, যারা আমাদের জন্য শুধু দুআ করার যোগ্যই হবে না; বরং জীবন ও সমাজকে সুন্দর, সুশীল ও সভ্য করতে সাধনায় মগ্ন হবে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির সমৃদ্ধি ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবে। আমাদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার পরিসর থেকে আমরা এমন একটা সমাজ প্রত্যাশা করতেই পারি, যা হবে মূল্যবোধনির্ভর। কাজেই, আমরা যে সুযোগ পেয়েছি, তার সদ্ব্যবহার দরকার। শুধু আফসোস করে সমাজের চলমান অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয়।

সন্তান-সন্ততি নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। আমাদের গাফিলতির কারণে ছোটো সোনামণিদের বেড়ে উঠা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেজন্য আমরা একটা প্রায়োগিক কৌশল কাজে লাগাতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোকপাত করা হয়েছে, যেন সুহৃদ পাঠক 'গুড প্যারেন্টিং' বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ও মৌলিক ধারণা পেয়ে যান এবং সন্তানদের গড়ে তুলতে সাধ্য মতো চেষ্টা করেন।

---

৩. সূরা হা-মিম-আস সাজদা, আয়াত-৩৩।

৪. সূরা বাকারা, আয়াত-২০১।

৫. সূরা আত-তাহরিম, আয়াত-০৬।

৬. সহিহ মুসলিম-৪৩১০।

প্যারেন্টিং : বাস্তবতা

প্যারেন্টিং একটি বহুমাত্রিক সংবেদনশীল বিষয়। সন্তানের বেড়ে উঠা নির্ভর করে মা-বাবা, বৃহত্তর পরিবার, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যমান মূল্যবোধসহ নানাবিধ অনুঘটকের ওপর। সবগুলো বিষয় একইসঙ্গে একই মাত্রায় মা-বাবার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্যও নয়। আবার মা-বাবাও এসব উপাদান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। অবশ্য কতক বিষয় এমন আছে, যা একান্তই ব্যক্তি পর্যায়ের এবং একটু মনোযোগ দিলেই শুধরানো সম্ভব। সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে কৌশল ঠিক করা খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন সমাজের সন্তান লালন-পালন বাস্তবতায় নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করা। এ তাড়না থেকেই এ অধ্যায়ে সচরাচর আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হই, প্রত্যক্ষ করি, সেগুলো বিশদ ব্যাখ্যা না করে শুধু চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন মাত্রা ও গভীরতার এই সমাজ বাস্তবতা এক নজরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনে রাখলে আমাদের গুড প্যারেন্টিং প্রস্তুতি পর্ব মজবুত হতে পারে।

১. স্বামী-স্ত্রীকেন্দ্রিক সমস্যা

- দুই পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের ভিন্নতা
- দুজনার আধ্যাত্মিক অবস্থানের ভিন্নতা
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বয়সের বড়ো ব্যবধান
- দুজনের লেখাপড়ায় অসামঞ্জস্য
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব
- কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব
- যৌথ পরিবারে সমন্বয়হীনতা
- দুজনের অতিরিক্ত বহির্মুখিতা
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অতি নির্ভরতা
- বড়ো পরিবারে কাজের অসম বণ্টন
- সামর্থ্যের বাইরে আর্থিক খরচ
- পরশ্রিকাতরতা
- সবসময় আপ্রাপ্তির অভিযোগ
- পর নর-নারীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক

- শারীরিক ও মানসিক পীড়ন
- একে অপর থেকে দীর্ঘসময় দূরে অবস্থান
- পরিবারের প্রধানকে মান্যতার ঘাটতি
- সন্তান গ্রহণে সময়ক্ষেপণ ও মনোমালিন্য
- একে অপরের আত্মীয়-পরিজনকে সহ্য করতে না পারা
- কাজের লোকের প্রতি অতি নির্ভরশীলতা
- স্ত্রীর আয়ের ব্যবহারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল
- ছোটোখাটো সমস্যায় তৃতীয় পক্ষকে জড়ানো
- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন
- স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ

২. সন্তানকেন্দ্রিক সমস্যা

- সন্তানকে সময় না দেওয়া
- নিজেদের প্রত্যাশা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া
- সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা-বাবার মতের ভিন্নতা
- নিয়মিত সন্তানকে সামনে রেখে ঝগড়া বিবাদে জড়ানো
- সন্তানের অতি কাছের মানুষ হিসেবে নিজেদের উপস্থাপনে ব্যর্থতা
- অতিরিক্ত কড়া শাসন
- সন্তানের মনস্তত্ত্ব না বোঝা
- লিঙ্গভেদে সন্তানদের মাঝে বৈষম্য
- সন্তানের কাছে মা-বাবার একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ
- জেদের বসে সন্তানকে নির্মম শাস্তি দেওয়া
- নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছার আগেই পড়াশোনার জন্য চাপ দেওয়া
- নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া
- সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে উলটো অবজ্ঞা করা
- স্বাভাবিক সময়ের অনেক পরে সন্তান হওয়া
- একক সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠা

৩. পরিবারকেন্দ্রিক সমস্যা

- মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতি
- পরনিন্দা বা পরচর্চা
- মিথ্যার প্রশ্রয়
- ধর্মীয় অনুশাসনে গাফলতি ও বাড়াবাড়ি
- পারিবারিক পরিবেশ আকর্ষণীয় না হওয়া
- পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি বিরূপ আচরণ

৪. সমাজকেন্দ্রিক সমস্যা

- আদর্শ জীবনবোধের অনুপস্থিতি
- সামাজিক অনাচারের বিস্তৃতি
- অর্থনৈতিক বৈষম্য
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- বিনোদনে রুচিহীনতা
- বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব
- ইন্টারনেট আসক্তি
- নিঃসঙ্গতা
- পর্নোগ্রাফি
- ফাস্টফুড আসক্তি
- গৃহবন্দি জীবন
- মাদকাসক্তি
- ভোগবাদিতা : ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ডিজে পার্টি
- সাংস্কৃতিক নোংরামী

শিশুর বিকাশে দক্ষতা পিরামিড

‘হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ধনসম্পদ আর সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়...’

সূরা মুনাফিকুন, ৯

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত উদ্যোগ। এর জন্য চাই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য এই পর্বে আমরা ‘দক্ষতা পিরামিড’ নিয়ে আলোচনা করব। দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ে বিশেষ পারঙ্গমতা, যা অন্যদের চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ‘বিশেষত্ব’ এনে দেয়। ফলে দক্ষ লোককে আলাদা করে চেনা যায়। দক্ষতা পিরামিড হলো ক্রমানুসারে সাজানো বিভিন্ন দক্ষতার সমাবেশ, যার শুরুতে নৈতিক দক্ষতা এবং সর্বশেষ উচ্চ স্তরে দেখানো হয়েছে সামাজিক দক্ষতা। সামাজিক দক্ষতাকে আমরা ‘লাইফ স্কিল’ বলতে পারি।
পিরামিডে উল্লেখিত দক্ষতার দফাসমূহ একজন শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনে ধাপে ধাপে অর্জন করলে তা ক্রমান্বয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করবে। একজন শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য পাঁচ ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার :

১. নৈতিক দক্ষতা (Moral Skill)
২. শিক্ষাগত উৎকর্ষতা (Academic Excellence)
৩. ভাষাগত দক্ষতা (Communicative Skill)
৪. বিশ্লেষণ দক্ষতা (Analytical Skill)
৫. সামাজিক দক্ষতা (Social Skill or Life Skill)

আলোকিত জীবনের পাথেয় কুরআন

কুরআন মানবসমাজকে অজ্ঞতার অন্ধতা থেকে বের করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য–

> ‘এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানবসমাজকে বের করে আনো অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে মহাক্রমশালী সপ্রশংসিত আল্লাহর পথে।’[৭]

[৭]. সূরা ইব্রাহিম, আয়াত-১।

মহানবি সা. বলেন–

'যে ঘরে কুরআন চর্চা হয় না, সেটি পোড়াবাড়ির মতো।'[৮]

পোড়াবাড়িতে যেমন লোক সমাগম হয় না, ধুলো ময়লার পাহাড় জমে, সাপ-বিচ্ছুর আবাসে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি কুরআনহীন গৃহ নিষ্প্রাণ দেহের মতো, ছন্নছাড়া জীবনের মতো। কুরআনের সাথে বেড়ে উঠতে হলে সাধ্যমতো মুখস্থ করা এবং অর্থ বোঝার জন্য সাধনার প্রয়োজন।

এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অনুসরণীয় কাজ হতে পারে চারটি :

- কুরআন তিলাওয়াত করা
- কুরআন বোঝা
- কুরআন মানা
- কুরআন শেখানো

শিশুর কুরআন শেখার হাতেখড়ি

কুরআনে আগ্রহী করার জন্য প্রথম কুরআন মাজিদ হাতে নেওয়ার দিন আমরা বাচ্চাদের সাথে নিয়ে বড়ো একটা লাইব্রেরিতে যেতে পারি। পবিত্র গ্রন্থ কুরআনুল কারিম কিনতে তার পছন্দকে অগ্রাধিকার দিতে পারি।

কুরআন বোঝার সহজ উপায়

১২ বছর লেখা-পড়া শেষ করার পর যদি আমাদের সন্তানরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো বিষয়ে লেখাপড়া করতে পারে, তবে এ বয়সে কেন কুরআন বুঝতে পারবে না? আসলে কুরআন বোঝার জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় গলদ আছে। কুরআনের প্রথম প্রজন্ম হচ্ছেন রাসূল সা.-এর সাথিগণ।

---

[৮]. তিরমিজি-২৯১৩।

তাঁদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানতেন না। ওই আমলে কোনো ব্যাকরণশাস্ত্রও ছিল না, ছিল না কোনো অভিধান। তাহলে এটা একটা বড়ো প্রশ্ন, তারা কীভাবে কুরআন বুঝতে পারলেন? এটা সর্বজনবিধিত যে, কুরআন মানার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আসলে কুরআন বোঝার জন্য শর্ত হচ্ছে–[৯]

- হিকমাহ
- কুরআনের মূল অপরিহার্য বিষয় বোঝা (তাযাককুর) এবং
- কুরআনের শব্দ, আয়াত, সূরা নাজিলের পটভূমি জেনে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়া (তাদাববুর)।

এখন বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে কুরআন বোঝার অনেক সহজলভ্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিরন্তর সাধনা থাকলে কুরআনের অনন্যতা, সর্বজনীন, অমীয়তায় অবগাহনের স্বর্ণদ্বার উন্মোচনও সহজ হতে পারে।

নিত্য চলার সাথি কুরআন

কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মানুষ। মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে কুরআন একদিকে সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস বিবৃত করেছে, যেন মানুষ সত্য-মিথ্যার দোলাচলে না হারিয়ে গিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। কুরআনে মৌলিক বিজ্ঞান এবং সৃষ্টির রহস্য চিন্তাশীল মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন তারা শোকরগোজারি ও বিনয়ী জীবনের অধিকারী হতে পারে। কুরআনে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, দায় ও অধিকারের বিধিবিধান দিয়েছে, যেন মানুষ সমাজে ইনসাফ ও সাম্য নিশ্চিত করতে পারে। অন্যদিকে কুরআন মানুষের চলার পথের ছোটোখাটো বিষয়ও বর্ণনা করেছে, যা মানুষকে সভ্য ও রুচিশীল মানুষে পরিণত করতে পারে। কাজেই কুরআনের ছায়াতলে বেড়ে উঠাই হতে পারে সঠিক সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধিমানের কাজ।

কুরআনের সাথে সখ্যতা

[৯]. কুরআন বুঝার সহায়িকা, কাজী সাগীর আহমদ, এসো কুরআন শিখি ফাউন্ডেশন।

নামকরণের দিক থেকে যা বারেবারে পড়া হয়, এমন কিতাবের নামই কুরআন। এই ক্রমাগত পাঠের রহস্য কী? কুরআন তো জীবনব্যাপী সফরের সাথি। একবার-দুবার পড়ে কুরআনের আয়নায় নিজেকে সাজানোর লক্ষ্য পূরণ হতে পারে না। কুরআনের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব শুধু সওয়াব বা নেকি অর্জনের জন্যই নয়; বরং অন্তর খুলে, দৃষ্টি প্রসারিত করে, প্রশস্ত পথে একে অপরের সাথে হাত ধরে গন্তব্যে পৌঁছানোই এর মূল কথা। নিজেকে রঙিন করার এই প্রেমময় সাধনায় আমাদের কাছে কুরআনের চাওয়া ঠিক এমন–[১০]

- ইক্বরা- পড়াশোনা করবে
- ইয়াকিলুন- যুক্তিশীল বিচার-বিবেচনা করবে
- ইয়াতাফাক্কারুন- চিন্তা-ভাবনা করবে
- ইয়াতাদাব্বারুন- গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে
- ইয়াফকাহুন- হৃদয়ঙ্গম করবে

কুরআনের এই চাওয়া পূর্ণ করতে হলে বারবার পড়তে হবে। এ পড়াশোনায় পরিবারের ছোটো-বড়ো সকল সদস্য অংশগ্রহণ করলে পুরো পরিবার নিয়ে আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথচলা সহজ হয়ে যাবে। এর ফলে যে অর্জন থলিতে জমা হবে, তা আমাদের চিন্তাশক্তিকে, উপলব্ধিকে ও জীবনবোধকে আরও পরিশীলিত করে আদর্শ পরিবারে পরিণত করবে নিশ্চয়। একইভাবে প্রতিটি পরিবারের কুরআন অনুশীলন একটি গতিশীল সমাজের সূচনা করতে পারে। কুরআনের স্পর্শে ও সৌরভে একটি কুটিল অন্ধকারময় সমাজ সাদা মনের সমাজে পরিণত হতে পারে, যার অনন্য উদাহরণ আইয়ামে জাহেলিয়া।

সঠিক বিশ্বাসে সন্তানদের বেড়ে ওঠা

সঠিক বিশ্বাসে সন্তানদের গড়ে তোলা মা-বাবার প্রধান দায়িত্ব। বিশ্বাস হচ্ছে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করা। বিশ্বাসে গোলমাল থাকলে এ জীবন ব্যর্থ। এই জন্য প্রান্তিকতাবর্জিত মধ্যম পন্থায় সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে। কুরআনে এ ধরনের লোকদের বলা হয়েছে মধ্যমপন্থী দল।[১১] আসলে শিরক, বিদআতমুক্ত জীবনই হচ্ছে ইসলামি জীবন। রাসূল সা. আনীত বিধিবিধানের অতিরিক্ত কিছুকে ইবাদাত মনে করাই বিদআত। প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে গোমরাহি আর গোমরাহির পরিণতি জাহান্নাম।[১২] বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তক ড. ইউসুফ আল কারজাভির মতে– কোনো নির্ভেজাল ধর্মীয় বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবনই কেবল বিদআত।

---

১০. পরিবারের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা, প্যারেন্টিং : সন্তান প্রতিপালনের কলাকৌশল, পৃ. ৫৪।

১১. সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৪৩।

১২. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫৩৫।

যেমন ঈমান, ইবাদাত ও এগুলোর শাখা-প্রশাখায় নতুন সংযোজন। কিন্তু জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো যেমন রীতি, ঐতিহ্য, প্রথা, প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে সংযোজন বা বিয়োজনকে বিদআত বলা যায় না।

সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ

ইসলাম জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। জীবনের সৌন্দর্য উপস্থাপন করে এবং জীবনকে অর্থবহ করার জন্য সরল ও বিনীত পথ দেখায়। এই সরল পথকেই বলা হয়েছে 'সিরাতুল মুস্তাকিম'। এই রাজপথের প্রত্যাশায় প্রত্যেক নামাজেই আমাদের প্রার্থনা 'আমাদের সরল-সোজা পথের দিশা দিন।'[১৩] সরল পথের বিধানই হলো কুরআন। জীবনের নান্দনিকতার যত উপকরণ আছে, কুরআনে আল্লাহু রাব্বুল আলামিন তা বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ কুরআনকে মানবজাতির জন্য হেদায়াত,[১৪] সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী[১৫] হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনের বিধানই সহজ ও সত্য বিধান। এর বিপরীত পথ ও পন্থাই ভুল ও মিথ্যা। কুরআনের ছায়াতলেই আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য ছেলেমেয়েদের কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। এতে আপনার অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে এবং সন্তানদের নিয়ে দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা কমে যাবে। ছেলেমেয়েরা যদি আমাদের জন্য দুআ করার যোগ্যই না হয়, তাহলে তাদের জন্য আমাদের সারা জীবনের ত্যাগ, প্রচেষ্টা, সাধনার মূল্য কোথায়?

ধর্মের মৌলিক বিষয়ের সাথে পরিচিতি

ইসলামের খুঁটি বা স্তম্ভ পাঁচটি। কালিমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। আমাদের পারিবারিক বলয়ে এসব বিষয় নিয়ে কোনো একাডেমিক আলোচনা হয় না। ফলে পরিবারে সবাই সমভাবে বেড়ে উঠে না। নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ভালোভাবে আত্মস্থ না করলে সারা জীবন কষ্ট করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলায় লেখা অনেক নির্ভরযোগ্য বইয়ের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও বাজে কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি।[১৬] সন্তানদের বুঝিয়ে দিন, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো অপরাধ।[১৭]
রাসূল সা. সাত বছর বয়সে নামাজের তাগাদা দিতে বলেছেন এবং ১০ বছর বয়সে নামাজি নিশ্চিত করতে বলেছেন।[১৮]

---

১৩. সুরা ফাতিহা, আয়াত-৫।
১৪. সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৮৫।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. সুরা আনকাবুত, আয়াত-৭৫, বুখারি, হাদিস নং-৮।
১৭. তিরমিজি, হাদিস নং-২৬২১।
১৮. মুসানাদে আহমাদ-৬৭৫৬।

ইউরোপ-আমেরিকায় যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম, তারা কিন্তু ঠিকই তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে খুবই সচেতন। সেখানে এমন অনেক সাপ্তাহিক ইসলামি স্কুল রয়েছে, যেখানে তারা নিয়মিত উপস্থিত হয় এবং আনন্দঘন পরিবেশে ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। আমাদের সবারই ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন অজু, গোসল, তায়াম্মুম, সফরের সময়ে নামাজের বিধান, নামাজের ওয়াক্ত, হিজাব, পবিত্রতা, মাহরাম, ইদ্দত ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে আয়ত্ত করা উচিত। এসব মৌলিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবের সাথেও আলোচনা করা যেতে পারে। বার্ষিক রুটিন তৈরি করে পালাক্রমে সকলের বাসায় অনুষ্ঠান করা হলে জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংও হবে এবং পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন তারা ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো শুধু জানবেই না; বরং অন্যদের কাছে তা উপস্থাপন করার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে।

হালাল-হারামের সচেতনতা

পারিবারিক জীবনে হালাল-হারাম মেনে চলুন। নীতিগতভাবে যা হারাম নয়, তাই হালাল। জীবনে হালালই বেশি প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দিন হালাল অল্প হলেও বরকতময়, আর হারাম দৃশ্যত বেশি মনে হলেও পরিণতিতে মন্দ। তাদের বলুন, ইবাদাত কবুলের শর্ত হলো হালাল আয়। সুস্থ দেহ আর প্রশান্ত মনের জন্য চাই হালাল রুজি। শৈশব থেকেই যদি হালাল হারামের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহলে ধর্মের বিধান মানার ক্ষেত্রে সন্তানদের সামনে আপনার আনুগত্য দৃশ্যমান হবে; যা জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রেও আপনি কাজে লাগাতে পারবেন।

শৈশব থেকেই মসজিদমুখী করুন

ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাদের মসজিদে নিতে অভ্যস্ত করুন। দেখবেন, ধীরে ধীরে তারা নামাজের নিয়ম কানুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। রাসূল সা. বলেন–

> ‘হাশরের মাঠে যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেদিন সাত শ্রেণির মানুষ সেখানে আশ্রয় পাবেন, তাদের মাঝে সেসব ব্যক্তিও থাকবেন, যাদের অন্তর সবসময় মসজিদের সাথে ঝোলানো থাকে।’[১৯]

আমাদের দুভার্গ্য, অনেক মসিজেদে ছোটো ছেলেমেয়েদের স্বাগত জানানো হয় না। অনেকক্ষেত্রে মুরুব্বিরা শোরগোল শুরু করেন– পেছনে যাও, এক পাশে দাঁড়াও ইত্যাদি বলে। এর কারণ, বাচ্চারা শিশুসুলভ চঞ্চলতার জন্য মসজিদে ছোটাছুটি করে, এদিক-ওদিক তাকায়, ফিসফিস করে একে অপরের সাথে কথা বলে। এতে বড়োদের নামাজে একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটে। এটা ঠিক।

তবে এও ঠিক, আমরা যারা আজ বড়ো হয়েছি তারাও কিন্তু এই দুরন্তপনার মধ্য দিয়ে শৈশব পার করেই বড়ো হয়েছি। শিশুর স্বভাবসুলভ আচরণের স্বাভাবিকতাকে মেনে নিতে না পেরে, তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের আচরণের প্রত্যাশা থেকেই সমস্যার শুরু হয়। এতে শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মনে করে মসজিদে তারা কাঙ্ক্ষিত নয়। রাসূল সা. বলেন–

> ‘যারা ছোটোদের আদর করে না এবং বড়োদের সম্মান দেয় না, তারা আমার দলভুক্ত নয়।’[২০]

একবার নামাজে রাসূল সা. সিজদায় দীর্ঘক্ষণ ছিলেন, সাথিরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন হাসান এবং হোসাইন আমার কাঁধে চড়েছিল।[২১] বিবেচনা করে দেখুন, যাঁর কাছ থেকে আমরা নামাজ পেলাম, শিখলাম আদরের নাতিরা কাঁধে চড়লেও তাঁর নামাজের কোনো অসুবিধা হয়নি। ছোটোখাটো বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে আমাদের উচিত মসজিদে ছোটো-বড়ো সবাইকে স্বাগত জানানো এবং একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা। এতে করে বড়োদের পাশাপাশি ছোটোরাও মসজিদকে আনন্দ লাভের জায়গা মনে করবে এবং এই শিশুই তার বেড়ে উঠার মধ্য দিয়ে নিজেকে একসময় সংশোধন করে নেবে।

সময়মতো হিজাবে অভ্যস্ততা

আজকের বিশ্বে হিজাব বহুল আলোচিত বিষয়। মুসলিম বিশ্বের গন্ডি পেরিয়ে হিজাব এখন আন্তর্জাতিক ইস্যু। হিজাব সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে প্রতি বছর ১লা ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক হিজাব দিবস। হিজাব নারী ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার নমুনা এবং অধিকারের প্রতীক। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জন্য নামাজ, রোজার মতো হিজাবও ফরজ। ইসলাম নারীর স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হিজাবের বিধান দিয়েছে। এটি নারীর ড্রেস কোড এবং আভিজাত্যের অংশ। যদিও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ইসলাম পোশাকের পৃথক বিধান দিয়েছে। পুলিশ, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি নানা পেশার লোকদের আলাদা বিশেষ পোশাক রয়েছে।

---

১৯. বুখারি- ৬৬০, মুসলিম- ১০৩১, তিরমিজি-২৩৯১।

২০. তিরমিযি-১৯২০, আহমদ-৬৬৯৪।

২১. নাসায়ি- ১১৪২, আহমদ- ৪৯৩।

দক্ষতার নানা দিক : শিক্ষা,ভাষা, বিশ্লেষণ

তোমার জন্য যা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা যদি দুই পাহাড়ের মাঝেও লুকানো থাকে, তবুও তা পৌঁছানো হবে। আর যা বরাদ্দ নেই, তা যদি দুই ঠোঁটের মাঝেও থাকে, তবুও তা পৌঁছবে না। -**ইমাম গাজালি**

জীবন কাঠামোতে নিজেকে মেলে ধরতে নানা ধরনের দক্ষতার দরকার হয়। সবাই সব বিষয়ে সমদক্ষতায় বেড়ে ওঠে না। ঝোঁক বা আগ্রহের জায়গা থেকেই অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পড়াশোনা চালিয়ে যায়, মনোযোগী হয়। ভাষার প্রতি কৌতূহলী শিক্ষার্থী ভিনদেশি ভাষা শেখে। কারও আবার গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নসাস্ত্র ভালো লাগে; ফলে গবেষনাধর্মী কাজে প্রাণ খুলে কাজ করে। অনুসন্ধিৎসু চোখের শিক্ষার্থী তথ্য-প্রযুক্তির দিকে নজর দেয়।

পাঠকে উপভোগ করার সুযোগ করে দিন

‘আম্মা বলেন পড় রে সোনা,
আব্বা বলেন মন দে,
পাঠে আমার মন বসে না,
কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।
তোমরা না হয় শিখছ পড়া মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হব,
পাখির মতো বন্য।’

-**আল মাহমুদ**

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে পাঠমুখী করতে হুমায়ুন আহমেদের তুলনা হয় না। একজন শিক্ষার্থীকে হুমায়ুন আহমেদের একটি উপন্যাস পড়তে দিলে সে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলতে পারে। কারণ, তাঁর বইতে পাঠক নিজেকে এবং তার পারিপার্শ্বিকতাকে খুঁজে পায়। এই খুঁজে পাওয়া থেকেই লেখকের প্রতি পাঠকের এত ভালোবাসা। সমাজের সমসাময়িকতাকে নান্দনিকতায় তুলে ধরতে পারলেই লেখক পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠেন। উপন্যাস পড়তে গিয়ে তার কোনো বাড়তি চাপ থাকে না, মুখস্থ করতে হয় না এবং পরীক্ষার খাতায়ও লিখতে হয় না। তাই গল্প-উপন্যাস নিয়ে মজে থাকে। এটা তো ঠিক, পড়ার টেবিলে একগাদা বই নিয়ে সময় কাটানো আর জ্ঞান অর্জন করা এক কথা নয়। মানতেই হবে জীবনে সফল এমন অনেকেই পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি।

কিংবা ভালো ছাত্র হিসেবে ক্লাসে সুনাম ছিল না। কাজেই পরীক্ষার রেজাল্টের পেছনে ছোটা বন্ধ করে সন্তানদের তাদের মতো করে সফল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ছেলেমেয়েরা আনন্দের জন্য, জ্ঞানের জন্য বা বোদ্ধা হওয়ার সাধনায় মগ্ন হোক, ফলের জন্য বা সার্টিফিকেটের জন্য নয়। অতি কথিত পরীক্ষার ফল দিয়ে কী হবে, যদি না তারা জ্ঞানে, উপলব্ধিতে, দক্ষতায় পরিপূর্ণ না হয়। চিন্তা-চেতনায় মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে না পারলে কখনো আলোকিত মানুষ হওয়া যায় না।

জিপিএ-৫ পাওয়াই কি জীবনের সবকিছু

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। বাস্তবতা হলো আমরা এখনও পাঠবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারিনি। এর দায় কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের নয়। মূলত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রত্যেক অংশীজনই এ অবস্থার জন্য কম-বেশি দায়ী। এ থেকে পরিত্রাণ চাইলে আমাদের মনন ও মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। সন্তানকে বরাবর ফার্স্ট-সেকেন্ড হতেই হবে, জিপিএ-৫ পেতেই হবে, স্কলারশিপ না পেলে মানসম্মান একেবারেই থাকবে না, এমন ভাবনা থেকে সরে আসতে হবে। ভালো ফলাফল অর্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে বাকি সব বিষয় বাদ দেওয়া যাবে না। যারা জিপিএ-৫ পায় না, জীবন তাদের কাউকেই নিরাশ করে না। বাস্তব জীবনেকে ভালো করবে, জগৎ আলোকিত করে স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। জীবনে সফল হওয়ার জন্য দুটো জিনিস দরকার– জ্ঞান ও দক্ষতা। জ্ঞান অর্জনের জন্য চাই পাঠ্য এবং পাঠ্যের বাইরের বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন। আর দক্ষতার জন্য প্রয়োজন অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার সক্ষমতা এবং সুযোগকে কাজে লাগানোর প্রজ্ঞা। দুটোতেই সাধনার প্রয়োজন।

অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে না পেরে কেউ আবার আত্মহননে ধাবিত হয়। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক চাপ সইতে না পেয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি হয়। কেউবা আবার চিরতরে মানসিক ভারসাম্য হারায়। সচেতন মা-বাবা নিশ্চয়ই সন্তানকে যেকোনো বিরূপ পরিবেশে আগলে রাখবেন, সাহস যোগাবেন এবং সামনের দিনের নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখাবেন। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি বড়ো অংশ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর পায় না, সেটাও তো সঠিক। এজন্য হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে লেগে থাকলে সাফল্য একদিন ধরা দেবেই।

সবাইকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারই হতে হবে কেন

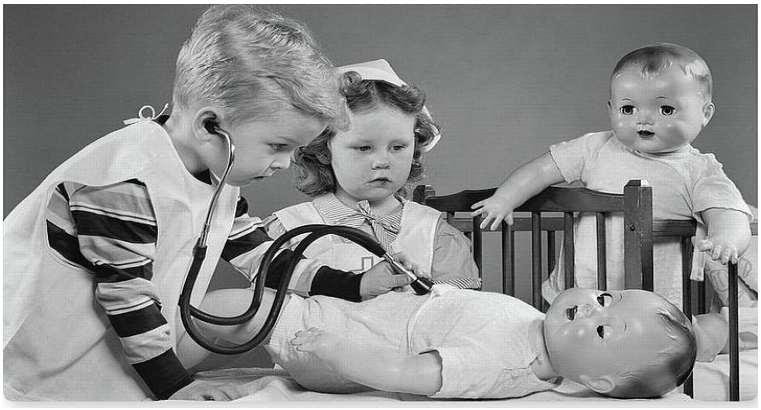

আমাদের দেশে মেধাবী মানেই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। সমাজে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন রয়েছে নিশ্চয়ই। তবে এটা তো একটা ছোটো পরিসর। যারা প্রশাসন চালায়, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারসহ সকলকেই প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। মেধাবীরা যদি প্রশাসনে না আসে, সমাজকর্মে লেখাপড়া না করে বা অন্য বিষয়ে আগ্রহী না হয়, তাহলে সমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে।

এখন তো পড়ার বিষয়েরও অভাব নেই। ফিজিওথেরাপি পড়েও যদি একজন মানুষ ডাক্তারের মর্যাদা পায়, তখন সমাজে অস্থিরতা এবং উচ্চশিক্ষায় ভর্তির চাপ কমে আসবে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বা হার্ভার্ড থেকে ডিগ্রি নিতে হয়নি; বরং স্কুলের শিক্ষক তাঁর মা-বাবাকে বলেছিলেন এ ছেলেকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যান। ড. মুহম্মদ ইউনুসকে তো ডাক্তারি পাস করতে হয়নি। মাহাথির মোহাম্মদ ডাক্তারি পাস করেও রাজনীতিতে জড়িয়ে আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হয়েও বিশ্বকবি। আর নজরুল তো চয়ের দোকানে চুলোর আগুন ঠেলেও নিজের কর্মগুণে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আসলে আমাদের দরকার দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ, তারা যেকোনো পেশাতেই কাজ করুক। তাই কোনো কিছু চাপিয়ে না দিয়ে সন্তানদের যা ভালো লাগে, আনন্দ লাগে, তা-ই পড়তে দিন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলই লিখতে পারা নয়, প্রয়োগ করা

শেখা আর লেখা এক বিষয় নয়। আমাদের শেখার সব উদ্দেশ্য গিয়ে ঠেকেছে পরীক্ষার খাতায় ঢেলে দেওয়ার মধ্যে। প্রায়োগিক শিক্ষার চেয়ে আমাদের পুঁথিগত বিদ্যায় আগ্রহ বেশি। যা শিখছি, তা প্রয়োগ করতে পারছি কি না, জীবনে কাজে লাগছে কি না, তার মূল্যায়ন দরকার। একজন শিক্ষার্থী যখন প্রশ্ন করতে শেখে, তার জানা বিষয়গুলো বাস্তবজীবনে কাজে লাগাতে পারে, কর্ম পরিবেশকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, শিক্ষা তখনই সফল হয়।

কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় হয়তো ভালো নম্বর পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বোধ, বিশ্বাস ও জ্ঞানের কাছে সে অসহায়। আসলে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার চেয়ে সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা, শৃঙ্খলায় অভ্যস্ততা ইত্যাদি বিষয়ও তাদের বেড়ে উঠাকে প্রভাবিত করে। আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে এসব মূল্যায়নের সুযোগ নেই। সন্তানদের বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে হবে, যার ফলে তাদের প্রয়োগ দক্ষতা বাড়ে, বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

শিক্ষিত হলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না

জ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক ও গভীর। প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে কেউ জ্ঞানী হয় না, এমনকী শুধু পাঠ্য বই পড়েও শিক্ষিত হওয়া যায় না। নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়নই জ্ঞানের প্রসার ঘটায়। জ্ঞানভিত্তিক সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তির ভাবনার ক্ষমতা বাড়ে, তারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাদের অবদানে সমাজে নানা উপযোগ বাড়ে। এভাবে পারস্পরিক জানাশোনায় সমাজ সামনে অগ্রসর হয়। পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত চাপ বরং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে পাঠবিমুখ করে তুলতে পারে। আবশ্যিক পাঠের বাইরেও কত যে শেখার বিষয় রয়েছে, যা না জানলে সভ্য হওয়া যায় না, স্বপ্ন বোনা যায় না। এমনতরো নানা বিষয়ে সন্তানকে কৌতূহলী করে তুলতে হবে।

সমন্বয়হীন শিক্ষাব্যবস্থা

বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, ইংরেজি ভার্সন, আলিয়া মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার নানা চক্করে পড়ে আমাদের নাভিশ্বাস অবস্থা। ব্রিটিশরা আসার আগে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। যাওয়ার সময় তারা বিভাজিত শিক্ষাব্যবস্থা রেখে যায়; যেন কেউ হয় মোল্লা আর কেউ হয় কেরানি!

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের সমভাবে বেড়ে উঠার জন্য একমুখী শিক্ষা খুবই জরুরি। একই ধারায় পড়ার পর, বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা কিংবা মুফতি, মুফাসসির, ফক্বিহ হওয়ার জন্য যার যে দিকে ঝোঁক, সে দিকে পড়তে দেওয়া উচিত। ফলে একটা পর্যায় পর্যন্ত সববিষয়েই সবাই মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে নাগরিকদের সমভাবে বেড়ে উঠার জন্য এটা খুবই জরুরি। এজন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। সামগ্রিকভাবে সমাজে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে যে নানামুখী শিক্ষার সুযোগ বহাল আছে, তা চালু আছে কেবল সমাজে এগুলোর চাহিদা রয়েছে বলেই। নতুন করে একমুখী চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলে অস্থিরতা কমে যাবে, বৈষম্য দূর হবে এবং সমাজে সমতা সৃষ্টি হবে।

পড়াশোনা মানে পরীক্ষায় দক্ষ হওয়া নয়

ফিনল্যান্ড ইউরোপের দেশ। সেখানে ১৮ বছরের আগে কাউকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয় না। আমাদের এখানে মুখস্থ ক্ষমতার প্রয়োগ নির্ধারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চালু হয়েছে বিচিত্র সব পরীক্ষা পদ্ধতি। শ্রেণি পরীক্ষা, বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা। পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি তো রয়েছেই। কোচিং সেন্টারেও চলে নিরন্তর মডেল টেস্ট। এভাবে আমরা পরীক্ষায় দক্ষ প্রজন্ম তৈরি করছি। এটা শিশুদের ওপর এক ধরনের নিপীড়ন। এত সব পরীক্ষার উদ্দেশ্য কী? প্রয়োজনের আগেই অতিরিক্ত চাপ তাদের অবসাদগ্রস্ত করে পড়াশোনায় অনীহা সৃষ্টি করতে পারে এবং যখন পরিশ্রম করার সময় হবে, তখন তাদের কাঙ্ক্ষিত মান পাওয়া যাবে না। পরীক্ষার নামে শিশুদের যেকোনো ধরনের শারীরিক মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

শৈশব থেকেই অনৈতিকতা শিখছে

বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়ে আমরা সন্তানদের কী শেখাচ্ছি? পরীক্ষার আগের রাতে ফেসবুকের দেয়ালে অনেকেই প্রশ্নপত্র সেঁটে দেন, ইমেইলে প্রশ্নপত্র যে ফাঁস হয়েছে– তার নমুনা আসে। সেসব ইমেইল বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাছেও যায়। তারা আগের রাতে পাওয়া প্রশ্নপত্র আর পরের দিনের সত্যিকারের প্রশ্নপত্রের ছবি পাশাপাশি প্রকাশ করে দেখিয়েছেন, প্রশ্নপত্র আসলেই ফাঁস হয়েছে কি না। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে পরীক্ষার্থীরা বলছে পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। কারণ, আগের রাতে কোচিং-এর স্যার এসে আমাদের কতগুলো প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন, আজকে সেসব প্রশ্নই পরীক্ষায় এসে গেছে। অনেক মা-বাবা আবার বসে থাকেন ফেসবুকে। প্রশ্নপত্রের নমুনা নিয়ে ছেলেমেয়েকে সেসব প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিচ্ছেন। শুরুতেই চুরিবিদ্যার জীবাণু নিয়ে অনৈতিকতার সাথে যে জীবনের শুরু, এর গ্লানি বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন ।

সন্তান আপনার, দায়িত্ব আমাদের

যান্ত্রিক জীবনে ব্যস্ত মা-বাবার জন্য অনেক স্কুল কলেজ এমনকী মাদ্রাসায় ভর্তির বিজ্ঞাপনে বলা হয় সন্তান আপনার, দায়িত্ব আমাদের। এর চেয়ে বাজে কথা আর হতে পারে না। সন্তান আপনার, দায়িত্বও আপনার। টাকা-পয়সা খরচ করলেই আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পয়সা খরচ করে সার্টিফিকেট পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না। আবার অনেকে মনে করেন হোস্টেলে দিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। এটিও একটি ভুল উদ্যোগ। একান্ত বাধ্য না হলে এ রাস্তায় পা বাড়ানো উচিত নয়। মানব শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মা-বাবার স্পর্শ, গন্ধ, সাহচর্য একান্ত দরকার।

শিক্ষকতাও হতে পারে পছন্দনীয় পেশা

উদার মূল্যবোধ নির্ভর আলোকিত সমাজ নির্মাণে শিক্ষা ও শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। পরীক্ষার খাতায় একসময় প্যারাগ্রাফ লিখতে হতো 'Your Favorite Teacher' বা 'Teaching as a profession'। আমরা উত্তরে লিখতাম শিক্ষকতা মহান পেশা, প্রিয় শিক্ষককে খাতায় ফুটিয়ে তুলতাম সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে। আসলেই পরিবারের গণ্ডির বাইরে শিশুমনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেন তার শিক্ষক। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই জায়গাটা আমরা উপেক্ষা করছি। জাতির কল্যাণে আমরা অনেক বড়ো কিছু করার স্বপ্ন দেখি। বড়ো লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো ছোটো জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে।

মেধাবীরা এখন স্কুলের শিক্ষকতায় আসতে চায় না। ফলে সামগ্রিকভাবে একটা শূন্যতা আছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। কারণ, আমরা সামাজিকভাবে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করতে পারিনি।

উন্নত বিশ্বে অবশ্য ব্যতিক্রম। সেখানে সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসতে পারে না নির্দিষ্ট ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে লেখাপড়া না থাকলে। আমরা যদি সন্তানদের ভবিষ্যতে শিক্ষকতায় আসতে উৎসাহিত করি, তবে পথ পাড়ি দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। এর জন্য দরকার গভীর অভিক্ষেপ, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি আর দেশ-জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা। ডাক্তার তো ব্যক্তির দেহ-মনের চিকিৎসা করেন, আর সমাজের অসুখ সারেন শিক্ষকেরা। ভারতের কেরালা রাজ্য শতভাগ শিক্ষিত মানুষের জনপদ। সেখানকার সংস্কৃতি হলো প্রতিটি পরিবার থেকে কেউ না কেউ নার্সিংকে ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা। সারা দুনিয়ায় বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলোতে কেরালার নার্সদের সুনাম রয়েছে। এ ধরনের সামাজিক প্রচেষ্টা থাকলে আমরাও পারি আমাদের প্রতিটি পরিবার থেকে একজন শিক্ষক উপহার দিতে।

সামাজিক দক্ষতা

‘প্রত্যেক নরম দিল, ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম।’ **মহানবি সা.**

আধুনিক দুনিয়ার মানুষ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত। বস্তুবাদী-ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত পরিণতিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। উন্নতির উৎকর্ষতার চূড়ায় অবস্থান করেও মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত। নৈতিক-নান্দনিক সত্তার বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য আমাদের প্রয়োজন সত্য-সুন্দর-দয়া-মায়া-মমতা-ভালোবাসার মনন ও অনুশীলন। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-ঐক্য-সংহতির সমাজ চাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিকতা-জবাবদিহিতা এবং সকল মানুষের কল্যাণাকাঙ্ক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে। এ বিষয়গুলো সামাজিক ও আবেগীয় বা নন-কগনেটিভ স্কিলের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক দক্ষতাকে উৎকর্ষপূর্ণ করতে হলে শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগীয় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের বিজ্ঞানমনস্ক, সৃজনশীল ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সহানুভূতি, মূল্যবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা,

আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, সহমর্মিতা, নৈতিকতা, দেশাত্ববোধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কোনো সমাজেই উপেক্ষণীয় বিষয় নয়। সামাজিক দক্ষতায় সফল হতে হলে এসব বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে এবং এগুলোর চর্চা পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে।

ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা (Love and Tolerence)

আমাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। যেসব বিষয়ে বিতর্ক নেই, সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে বিতর্কিত বিষয়ে আমাদের আগ্রহ বেশি। নব্বই ভাগ বিষয়েই আমরা সহমত পোষণ করি। তা সত্ত্বেও আমরা মতানৈক্যকেই বেশি গুরুত্ব দিই। একটা বহু ভাবনার সমাজে ‘একমাত্র ব্যাখ্যা’ বলে কিছু নেই। অনেক মত, অনেক পথ থাকতেই পারে। প্রয়োজন সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা। সব ফুল কিন্তু সৌরভ ছড়ায় না। কাজেই, ভিন্নমতের ভাষা হতে হবে মার্জিত ও রুচিশীল। এ ধরনের ইতিবাচক আচরণের সাথে সন্তানদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

হৃদয়ের প্রশস্ততা

নানা প্রয়োজনে মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল হয়। এই নির্ভরশীলতা প্রাকৃতিক বিধান। সমাজে সবাই সমভাবে বেড়ে ওঠে না। যারা বড়ো হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া। কৃতজ্ঞতাবোধ আরও ব্যাপক প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর শোকরগোজারির উত্তম উপায় হলো অন্য সকলের প্রয়োজনে প্রশস্ত হৃদয়ে সাধ্যমতো নিজেকে নিয়োজিত করা। রাসূল সা. বলেন–

> 'যে ব্যক্তি আমার কোনো অনুসারীকে খুশি করার জন্য তার প্রয়োজন পূর্ণ করল, সে আমাকে খুশি করল। যে আমাকে খুশি করল, সে আল্লাহকেই খুশি করল। আর যে আল্লাহকে খুশি করল, তাকে তিনি জান্নাত দান করবেন।'[২২]

যে মা-বাবা অন্যের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার সুযোগ খুঁজে বেড়ান, তাদের সন্তানরা অনন্য হয়ে বেড়ে উঠবে এটাই তো প্রত্যাশিত।

অগ্রাধিকার দেওয়া (Empathy)

কারও ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া দরকার। তাড়াহুড়া আছে হয়তো বাসায় কেউ অসুস্থ বা সন্তানকে স্কুল থেকে আনতে হবে। কারও বাসে উঠা দরকার, লাইনের অনেক পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন কখন বাস আসবে, কখন বাসায় পৌঁছবেন– স্ত্রী অসুস্থ তার জন্য ওষুধ কেনা হয়নি। এ ধরনের নানামুখী বাস্তবতায় আমাদের প্রতিদিনের জীবনচিত্র। আমাদের সমাজে একে-অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নমুনা খুব একটা দৃশ্যমান নয়। সমাজে সবাই যদি একে-অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত, অগ্রাধিকার দিতে পারত, সেই সমাজটা কেমন সুন্দর হতো আমরা কেবল তা কল্পনাই করতে পারি! আসলে অন্যের প্রয়োজনে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রেরণা পরিবার থেকেই অভ্যস্ত হতে হবে। অনেক ছোটো কাজের জন্য বড়ো মন দরকার, যা সবার থাকে না। এটা অর্জন করতে হয়। পরিবারই হলো এ সাধনার তীর্থভূমি।

---

[২২]. বায়হাকি।

কল্যাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা

খবরের কাগজে প্রায়শই সাদামনের মানুষের কীর্তিগাঁথা ছাপা হয়। কেউ বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়ে চলছেন বছরের পর বছর ধরে। কেউ আবার পথের দু'ধারে শত শত গাছ লাগিয়েছেন পরিবেশকে শীতল ও মনোরোম রাখতে। নিজে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, রিক্সা চালিয়ে জীবন চালান, এমন লোকেরও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার খবর ছাপা হয়। এগুলো এমনিতেই হয় না, মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা থেকে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার এমন আরও অসংখ্য উদাহরণ স্বরণ করা যায়। তাঁরা নিশ্চই পত্রিকার পাতায় খবর ছাপা হবে এই নিয়তে জনসেবা করেন না। প্রতিদিন মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিন আমাদের ডাকেন 'কল্যাণের দিকে আসো (হাইয়া লাল ফালাহ)।' রাসূল সা. বলেন–

'জাহান্নাম থেকে বাঁচো; অর্ধেকটা খেজুর দান করে হলেও।'[২৩]

আমাদের দুনিয়ায় কাজ হলো ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাওয়া। অপরের কল্যাণকামী হওয়া একটা বিরল মানবিক গুণ। এজন্য দরকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। আমরা নিশ্চয়ই চাইব আমাদের সন্তানরা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হোক এবং তারাও একদিন অনেকের মাঝে অনন্য হয়ে উঠুক।

রোগীর খোঁজখবর নেওয়া

রোগী দেখতে যাওয়া, তার খোঁজখবর নেওয়া সওয়াবের কাজ। এতে শুধু দায়িত্ববোধ বাড়ে না; বরং পারস্পরিক সম্পর্ককে উষ্ণতায় ভরে দেয়। রোগীর কাছে গেলে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে, কুশলাদি জানতে চাইলে রোগীর মানসিক প্রশান্তি বাড়ে এবং সাময়িক উপশমও হয়। রোগীর কাছে দুআও চাইতে বলা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে রোগীর খোঁজখবর রাখা, তার জন্য দুআ করা,

---

[২৩]. বুখারি-১৩৩১, মুসলিম- ২২৪০।

রোগীর নিকটজনকে সবরের পরামর্শ দেওয়া ছোটো বিষয় মনে হতে পারে। অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত বা দীর্ঘদিন বিছানায় শায়িত রোগীর বিষয়ে আত্মীয়স্বজনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

আপনার প্রচেষ্টা রোগ লাঘবে সামান্য হলেও মমতার পরশ ছড়িয়ে দিতে পারে। নিকটজন নিয়ে আপনার উদ্‌বেগ, পেরেশানি, দুআ, সাদকা ইত্যাদি আপনার সন্তানদের জন্য নীরব শিক্ষা (Silent Learning)।

অনুমতি চাওয়া

শিশুরা কৌতূহলপ্রিয়। নতুন বিষয়, নতুন পরিবেশ তাদের আকর্ষণ করে। বাচ্চাদের শিখতে দিন, কারও অনুমতি না নিয়ে তার জিনিস ধরতে নেই। কারও ঘরে অনুমতিনিয়ে প্রবেশ করতে হয়। পারিবারিক বলয়ে এসব না শিখলে বাস্তবে শোধরানো কঠিন। এসব খুটিনাটি বিষয় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে জড়িত। তাই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

দুঃখ প্রকাশ

চলতে ফিরতে ভুল হতেই পারে। মানুষেরই ভুল হয়। ভুল হয়ে গেলে নিঃসংকোচে দুঃখ প্রকাশ করলে ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্ককে আরও শানিত করে। আমাদের সমাজে আমরা কেউ ভুল স্বীকার করতে চাই না। আমাদের ধারণা ভুল স্বীকার করলে বা ক্ষমা চাইলে মনে হয় আমরা ছোটো হয়ে গেলাম। বড়োরা ভুল স্বীকার করলে ছোটোরা স্বভাবগতভাবেই শিখবে যে, ভুল করলে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। শেখানোর কাজে বড়োদের অবশ্যই নিজেদের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

সম্পর্কের প্রসারতা

বহুমাত্রিক সমাজে নানা পেশার মানুষের সাথে এবং নানা পরিসরে জানাশোনা থাকলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। এটি একটি বিশেষ দক্ষতা। যার আন্তঃব্যক্তিক পরিধি যত ব্যাপক, সমাজে তার অবস্থান তত উঁচুতে এবং তার অবদান রাখার সক্ষমতাও বেশি। সবাইকে বন্ধু বানিয়ে ফেলা সহজ কাজ নয়। অন্যের মনের মণিকোঠায় নিজের জায়গা করে নিতে হলে, তাকে আপন করে নিতে হলে সকলের সাথে মেলামেশার যোগ্যতা থাকতে হবে। আত্মকেন্দ্রিক হলে কিংবা ঘরমুখো হয়ে থাকলে বা শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমরা অনন্য হতে পারব না।

সন্তান পালনে পারিবারিক প্রস্তুতি

‘হে প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দিন।’ **সূরা ফুরক্বান, ৭৪**

প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতিরই সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সে ইচ্ছা সহজে পূরণও হয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। সহজ হওয়ায় অনেক সময়ই আমরা এই প্রাপ্তির গুরুত্বকে উপলব্ধি করি না। ফলে এত সাধের পাওয়া সন্তানের লালন-পালনের বিষয়টি আমাদের কাছে যথাযথ গুরুত্ব পায় না। এ বিষয়ে সফল হতে হলে, এর শুরুটা করতে হবে বিবাহ বন্ধনের আগেই। প্রস্তুতি ছাড়াই ঘটা করে একজন নর-নারীর পারস্পরিক বন্ধন অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়।

বিয়ের আগেই প্যারেন্টিং প্রস্তুতি

একটা অনাগত শিশুর এই অধিকার আছে যে, সে তার পিতা-মাতাকে একজন আদর্শ পিতা-মাতা হিসেবে পেতে চাইবে। আদর্শ বলতে তাঁরা হবেন নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন; যেন তাদের দেখে, অনুসরণ করে সে সন্তান হতে পারে প্রকৃত অর্থেই ভদ্র, সভ্য, মার্জিত, সজ্জন ও সত্যনিষ্ঠ। এজন্য তেঁতুল গাছ থেকে ল্যাংড়া আম প্রত্যাশা করা যেমন বোকামি, ঠিক তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রাধিকার না দিলে পাত্র-পাত্রী দু’জনেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার আগেই প্রস্তুতি নিলে অনেক বিষয় সহজ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক বা খোদাভিরুতাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিবাহ পরবর্তী পারিবারিক অশান্তির উদাহরণ একেবারে কম নয়।

পরিশুদ্ধ বিবাহিত জীবন

ইসলাম বিয়েকে সহজ করেছে এবং মোহরকে বিয়ের শর্ত করেছে। মোহর ব্যতিত বিয়ে শুদ্ধ হয় না। একজন নবাগত নারীকে সম্মানস্বরূপ প্রদেয় অর্থ নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। এই অর্থে একজন বিবাহিত নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার কথা, যদিও বাস্তবতা ভিন্ন। সমাজে অনেক বড়ো অঙ্কের মোহরানা ধার্য্যের মাধ্যমে আভিজাত্যের প্রদর্শনী মোহরানার উদ্দেশ্যকে অনেকক্ষেত্রেই তামাশায় পরিণত করেছে। মোহর আদায়কে বাস্তবতায় আনতে পারলে নারীর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার আরও সংহত হতো। প্রত্যেক মা-বাবার উচিত কন্যাসন্তানের মোহর নিশ্চিত করেই বিয়েতে সম্মত হওয়া এবং ছেলেসন্তানের ক্ষেত্রে মোহর দিয়েই বধূবরণ করা।

নিরাপদ মাতৃত্ব

'মা' হওয়ার মাধ্যমেই মাতৃত্বের বিকাশ ঘটে ও নারীজীবন পূর্ণতা পায়। গর্ভধারণ কেবল প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র নয়। এটি একটি নতুন মাত্রার অঙ্গীকার। মায়ের গর্ভধারণের আগেই পরিকল্পনার প্রয়োজন। ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া, নিয়মিত চেকআপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, প্রসবকালীন প্রস্তুতিসহ কর্মজীবী মায়ের মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন। একজন গর্ভবতী মায়ের সুস্থতা বলতে শুধু শারীরিক সুস্থতাই বোঝায় না। মানসিক সুস্থতাও নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের সার্বিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে সন্তানের সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশ। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের বিশেষ করে হবু পিতার নিবিড় সাহচর্য ও সহযোগিতা মায়ের গর্ভকালীন সময়কে সহজ করে তোলে। সহানুভূতিশীল পারিবারিক পরিবেশ ছাড়া গর্ভবতী মায়ের মানসিক সুস্থতা বজায় থাকা সম্ভব নয়।

শিশুর জন্মোৎসব

জন্মের পর শিশুর পিতার চারটি কর্তব্য আছে :

১. অর্থবহ নাম রাখা

২. সপ্তম দিনে আকিকা করা

৩. মাথা ন্যাড়ানো

৪. চুলের ওজন পরিমাণ সোনা অথবা রুপা সাদকা করা (সামর্থ্য থাকলে)

অনেকেই নাম রাখতে অহেতুক দেরি করেন এবং আকিকা করতে বিলম্ব করেন। শিশুর জন্ম-পরবর্তী সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে আকিকার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া অর্থবহ নাম রাখা উচিত। শিশুর নামের সাথে তার আচরণের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। ধারণা করা যায়, ভালো নামের মানুষ সাধারণত ভালোই হওয়ার কথা।

জন্ম নিবন্ধন

আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুর জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। শিশুর সঠিক জন্ম তারিখ সংবলিত নিবন্ধন পরবর্তী সময়ে অনেক কাজে লাগে। বিশেষ করে স্কুলে ভর্তির সময়, পাসপোর্ট করার সময়ে বা ব্যাংকে শিশু বা নাবালকের নামে হিসাব খোলার সময়ে। সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জন্ম নিবন্ধন সনদ দিয়ে থাকে। আলস্য না করে সময় মতো জন্ম নিবন্ধন করা উচিত। নিবন্ধনের সময় শিশুর নামের বানানের ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত।

সন্তান মায়ের জীবনধারা পালটে দেয়

এমন মা নেই, যার কোনো কাজ থাকে না। কারণ, নবাগত শিশু একজনকে শুধু মা হিসেবেই পায় না, তার জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তনগুলো খাপ খাইয়ে নিতে হবে। শিশুকে বারবার খাওয়ানো, ন্যাপকিন পরিবর্তন, সোনামণির জন্য প্রায়শই নির্ঘুম রাত কাটানো বিশেষ করে শিশুর টিকা দেওয়ার দিনগুলোতে পারিবারিক অন্যান্য কাজ সামাল দেওয়া, নতুন মা-কে মানসিক ও শারীরিকভাবে পরিশ্রান্ত করে তোলে। কাজেই একইসঙ্গে আদর্শ স্ত্রী, মা, গৃহিণী বা পূর্ণকালীন চাকুরিজীবী হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন সময়ে করা যায়। শিশু কিছুটা শক্ত-সামর্থ্য হওয়া পর্যন্ত মায়ের শিশুর দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। পরিবারের সদস্যরা হাত বাড়ালে মায়ের স্বস্তি বাড়ে। যৌথ পরিবারে সহজ হলেও শহুরে এককেন্দ্রিক পরিবারে একাকী সন্তান পালন মা-কে বিপর্যস্ত করে তোলে। যাদের আর্থিক টানাপড়েনের মধ্যে চলতে হয়, তাদের অবস্থা আরও কঠিন।

বয়স কমিয়ে শুরুতেই গলদ

অনেক নামি-দামি স্কুলে শিশু শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়সের বাধ্যবাধকতা থাকে। ভর্তি যুদ্ধে সফল হওয়ার বাসনায় ব্যস্ত অভিভাবক বয়স কমিয়ে স্কুলে ভর্তি করান। 'জন্ম তারিখ' সারা জীবন কাজে লাগে প্রায় প্রতি প্রয়োজনীয় কাজে। জীবনের প্রাথমিক স্তরে এই যে মিথ্যার শুরু, এটা যে কতটা আত্মপ্রবঞ্চনার কারণ নিজেরা কখনো ভেবে দেখি না। আবার অনেকেই বয়স কমিয়ে দেখান এই অজুহাতে যে চাকরির বাজারে কাজে লাগবে এবং বেশি সময় ধরে চাকরির বাজারে লেগে থাকতে পারবে। আল্লাহ হচ্ছেন রিজিকদাতা। বয়স কমিয়ে রিজিকের দায়িত্ব নিজের কাছে নেওয়া শিরকের গুনাহ। সত্যনিষ্ঠ মা-বাবার এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

প্যারেন্টিং আচরণ

সন্তান লালন পালনে সফল হতে হলে অবশ্যই সচেতনভাবে প্যারেন্টিং কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। সন্তানভেদে কৌশলও হতে হবে বাস্তবসম্মত। গতানুগতিক ধারায় সন্তানের বেড়ে উঠা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে কষ্ট হতে পারে। এ থেকে উত্তোরণের উপায় হলো বিভিন্ন ধরনের প্যারেন্টিং কৌশল সম্পর্কে জানা এবং জুতসই পদ্ধতি অবলম্বন করা। মা-বাবার আচরণ বিশ্লেষণ করলে চার ধরনের প্যারেন্টিং আচরণ (Parenting Behavior) লক্ষ করা যায় :

- আবেগপ্রবণ প্যারেন্টিং (Emotional Parenting)
- স্বাভাবিক প্যারেন্টিং (Natural Parenting)
- কৌশলগত প্যারেন্টিং (Strategic Parenting)
- আগ্রাসী প্যারেন্টিং (Aggressive Parenting)

আবেগপ্রবণ প্যারেন্টিং (Emotional Parenting)

প্যারেন্টিং আচরণের মধ্যে ইমোশনাল প্যারেন্টিং হলো প্রান্তিকধর্মী ও ক্ষতিকর। ইমোশনাল প্যারেন্টিং বলতে বোঝায় সন্তান প্রতিপালনে অতিরিক্ত আবেগাশ্রয়ী হওয়া বা সন্তানের পারিপার্শ্বিকতাকে সামলাতে যেয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। প্রত্যেক মা-বাবার কাছেই সন্তান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের বেড়ে উঠার ভালোমন্দের সর্বজনস্বীকৃত স্বাভাবিক মান রয়েছে। এই স্বাভাকিতার বাইরে যেয়ে মা-বাবা তাদের মতো করে সন্তান বড়ো করতে চান, বাচ্চার সব ধরনের ইচ্ছা পূরণ করতে চান, যা চায় তা-ই দিতে চান। তবে আপনাকে ভাবতে হবে, আপনি আপনার সন্তানের ক্ষতি করছেন না তো!

মনে রাখতে হবে সন্তানকে সবসময় সবার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া অন্যতম আবেগীয় আচরণ। অর্থাৎ এরকম মনে করা যে আমার বাচ্চা কোনো ভুলই করতে পারে না, কোনো মিথ্যা বলতে পারে না, কিংবা যা বলে তা-ই ঠিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আপনার বাচ্চা এসে অভিযোগ করল যে পাশের বাসার বাচ্চা তাকে মেরেছে। এখন আপনি কোনো কিছু যাচাই না করেই পাশের বাসার গিয়ে বকাঝকা শুরু করলেন অথবা ওই বাচ্চার মা-কে গিয়ে নানান ধরনের কথা শুনিয়ে আসলেন। এই আচরণ সঠিক হতে পারে না। এতে আপনার সন্তান আশকারা পায়; তার মধ্যে এই প্রবণতা তৈরি হয় যে, সে সবসময়ই ঠিক। সে নিজে ভুল করলেও রংচঙ মাখিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন মনে হবে সে-ই ঠিক। অনেক সময় বাচ্চা নিজেকে অন্য বাচ্চার থেকে সুপিরিয়র ভাবা শুরু করে। আর যেহেতু মায়ের কাছে এ ধরনের অভিযোগ করার সুযোগ পায় এবং মায়ের প্রশ্রয় তাকে ভুলভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

অনেকক্ষেত্রেই শিশুর এ আচরণ তৈরি হওয়ার পেছনে মা নিজেই দায়ী। বাচ্চার মানসিকতায় মা এটা গেঁথে দিলেন যে, এত বড়ো সাহস আমার ছেলেকে বা মেয়েকে এটা করল অথবা আমাকে এটা বলার দুঃসাহস দেখাল। অথচ দুটো বাচ্চা খেলতে খেলতে ঝগড়া লেগে যাওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। ওরা ঝগড়া করবে আবার মিলে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা একেবারেই ন্যাচারাল একটা ব্যাপার। এখন এ ব্যাপারটাকে খুব সিরিয়াসলি না নিয়ে বাচ্চার অভিযোগ পাওয়ার পর মা যদি বাচ্চাকে বলতেন, 'বাবা তোমরা দুজন তো খুবই ভালো বন্ধু। সে কেন শুধু শুধু তোমাকে মারবে? তুমি কি ওকে আগে কিছু বলেছ?' অথবা 'বাবা তোমরা দুজন তো খুবই ভালো বন্ধু। ও হয়তো ইচ্ছে করে দেয়নি। খেলতে গিয়ে লেগে গিয়েছে।' এটা যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে বাচ্চার অযথা অভিযোগ করার প্রবণতা তৈরি হবে না।

স্বাভাবিক প্যারেন্টিং (Natural Parenting)

স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল প্যারেন্টিং হলো সন্তানের সাথে যখন যেমন আচরণ করা দরকার, ঠিক সেরকম আচরণ করা। তাকে খুব প্রশ্রয় না দেওয়া। আবার এটা করতে গিয়ে সে যেন নিজেকে অবহেলিত না ভাবে। বাচ্চা যেন এটা বুঝে যে, আপনি তাকে খুব আদর করেন। অনেক ভালোবাসেন তবে সে কোনো অন্যায় করলে আপনি তাকে প্রশ্রয় দেবেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো খেলনার দোকানে গিয়ে আপনার ছেলে বা মেয়ে যা দেখছে, সবই নিতে চাচ্ছে। বাচ্চা হিসেবে তার এ আচরণ করাটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু এখন আপনি যদি তাকে ইচ্ছেমতো বকাঝকা শুরু করে দেন, 'কেন তুমি এমন করছ? যা দেখছ তাই নিতে চাচ্ছ...' ইত্যাদি। এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হবে। এতে বাচ্চার জিদ আরও বেড়ে যেতে পারে। আবার এ অবস্থায় আপনি যদি তাকে সব কিনে দেন সেটাও তার জন্য ভালো হবে না। এতে করে বাচ্চার মধ্যে র‍্যাশনালিটি তৈরি হবে না। এতে করে বাচ্চার এই বোধ তৈরি হবে না যে যা কিছু চাওয়া যায় তার সবকিছুই পাওয়া যায় না অথবা একটা সময় যখন সে চাইলেই সবকিছু পাবে না, তখন তার মধ্যে হতাশা কাজ করবে। এমন অবস্থায় আপনি যদি তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন, 'বাবা,

আমরা তো সব খেলনা নিতে পারব না। তুমি যেকোনো একটা নাও, আমরা পরে আবার আসব এখানে। তখন তুমি অন্য আরেকটা নিও।' তবে স্বাভাবিক প্যারেন্টিং-এর সাথে যদি কৌশলগত প্যারেন্টিং-এর সমন্বয় করা যায়, তবে এটাই হবে সবচেয়ে কার্যকর প্যারেন্টিং স্টাইল।

কৌশলগত প্যারেন্টিং (Strategic Parenting)

কৌশলগত বা Strategic Parenting প্রয়োজন হয় যখন শিশুকে মা-বাবা সামলাতে পারেন না। সাধারণত জেদি, কথা শুনতে চায় না বা আচরণে কিছুটা বেপরোয়া এমন বাচ্চাদের জন্য কৌশলগত আচরণ প্রযোজ্য। যেমন ধরুন আপনি বাচ্চাকে বললেন, 'যদি তুমি এখন স্কুলে যাও তবে বিকেলে আমি তোমাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাব' অথবা 'তুমি যদি এখন ম্যাথ করো তবে আমি তোমাকে একটা গাড়ি খেলনা কিনে দেবো।' তবে সবসময় কৌশল অবলম্বন করাটা কার্যকর নাও হতে পারে। বাচ্চার ধরন বুঝে মা-বাবারা বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন সন্তানের কাছে এ ধারণা না যায় আপনি মিথ্যা বলছেন বা শঠতার আশ্রয় নিচ্ছেন।

আগ্রাসী প্যারেন্টিং (Aggressive Parenting)

আগ্রাসী প্যারেন্টিং আচরণ হলো আবেগীয় প্যারেন্টিং আচরণের বিপরীত এবং এর ক্ষতির গভীরতাও বেশি। আগ্রাসী প্যারেন্টিং আচরণের বৈশিষ্ট্য হলো মা-বাবা সন্তানের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেন না, ছোটো-বড়ো সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি করেন, অল্পতেই রেগে যান এবং সন্তানের বিষয়ে কোনো অভিযোগ আসলে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই তার ওপর খড়্গ হন। মা-বাবা উভয়ই যদি আগ্রাসী আচরণ করেন, তবে তা সন্তানের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সন্তানের ঘরে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরণের আচরণধারী পিতা-মাতা অনেকেই সন্তান লালনপালনের সময়কে তাদের সুসময়ে নিজেদের বেড়ে উঠাকে মেলাতে চান এবং মনে করেন 'মাইরের ওপর ওষুধ নাই'। সময়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতিও বদলায়। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে সন্তান আপনার নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। কাজেই সন্তান পালনে কোনোমতেই চরমপন্থা অবলম্বনের সুযোগ নেই।

সিঙ্গেল প্যারেন্টিং

একজন নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি সামাজিক চুক্তি। পরবর্তী সময়ে দয়া-মায়া-কর্তব্য-যত্ন-ভালোবাসা এই সম্পর্কটিকে গভীরতায় নিয়ে যায়। আবার বিপরীত চিত্রও আছে। দুঃসহ যাতনা সইতে না পেরে অথবা প্রত্যাশা প্রাপ্তির অনুযোগ থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরিবার ভেঙেও যায়। যেকোনো সন্তানের জন্য মা-বাবার মধ্যে টানাপোড়েন এবং এর পরিণতিতে সম্পর্কচ্ছেদ মেনে নেওয়া অনেক কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিক্ততার মধ্য দিয়েই সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। একক মা কিংবা একক বাবার সাথে বেড়ে উঠা সন্তানেরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারে। মনে রাখবেন মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক চুক্তিভিত্তিক নয়, প্রাকৃতিক। বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেই স্বামী সাবেক স্বামী এবং স্ত্রী সাবেক স্ত্রীতে পরিণত হন। কিন্তু তারা কেউ সাবেক মা, সাবেক পিতা হয়ে যান না। যেকোনো কারণে বিচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে পড়লে সন্তানদের জন্য তা যেন ব্যাপকভাবে ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য উভয়কেই এবং উভয় পরিবারকেই সচেতন থাকতে হবে। সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য মা-বাবা উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মা-বাবা উভয়কেই সংযত আচরণ করা উচিত। তাদের মধ্যে এমন একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার যেন সন্তানের সাথে সময় কাটানো, বেড়ানো, দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদি অব্যাহত থাকতে পারে।

প্রতিবন্ধী সন্তানের প্যারেন্টিং

সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। প্রত্যেক মা-বাবার জন্য এটা একটা কষ্টকর অভিজ্ঞতা। এই অবস্থায় অনেক মা-বাবা সংকুচিত থাকেন, সন্তানদের নিয়ে বাইরে কোথাও যেতে চান না। আবার অনেকেই মনে করেন প্রতিবন্ধী সন্তান হলো মা-বাবার অপরাধের শাস্তি। এমনটা মনে করা ধর্মসম্মত এবং বাস্তবসম্মত নয়। জীবন হলো পরীক্ষাগার। আল্লাহ কাউকে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করেন, কাউকে নিঃসন্তান রেখে পরীক্ষা করেন। কাউকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দেন আবার কাউকে পথের ভিখারি বানিয়ে পরীক্ষা নেন। বিশ্বাসীদের কাজ হলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য কষ্ট, যাতনা, শ্রম ও সবর মা-বাবার জন্য আল্লাহর কাছে বড়ো প্রাপ্তির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। তাই মনোঃকষ্টে না ভোগে সাধ্যমতো সন্তানকে আগলে রাখাই হতে পারে পরীক্ষায় সফল হওয়ার উত্তম উপায়।

সন্তানদের বেড়ে উঠায় পারিবারিক বন্ধন

পরিবার সমাজের খুঁটি। খুঁটি যত দৃঢ় হবে সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিও তত শক্ত হবে। ফলে আমাদের স্বপ্নপূরণের পথে সামগ্রিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে পরিবার। পারিবারিক বন্ধন মজবুত হলে পরিবারের সদস্যদের প্রাণবন্ত ও আদর্শ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠা সহজ হবে। এজন্য পারিবারিক পরিবেশ, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক বোঝাপড়া, একে অপরের প্রতি দায় ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি আদর্শ পরিবার তৈরিতে অবদান রাখতে পারে।

মা-বাবাই সন্তানের রোল মডেল

আমরা নিজেরা যদি আমাদের সন্তানের কাছে রোল মডেল হতে না পারি, তবে এ ব্যর্থতার দায় নিশ্চয়ই তাদের নয়। প্যারেন্টিং নিয়ে কাজ করেন এমন এক সমীক্ষায় একজন বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা হলো, শতকরা ৯৫ ভাগ ছেলেমেয়েই তাদের মা-বাবাকে আদর্শ মনে করে না। এই চিত্র নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে শুধু মা-বাবা হিসেবেই পায় না, তারা সন্তানদের সবচাইতে নিকটজন, বন্ধু, অভিভাবক, প্রেরণার উৎস, দুঃখ-কষ্টের সাথি, নিরাপত্তার আশ্রয়। কাজেই, সন্তানদের উষ্ণতায় আগলে রাখুন এবং পরিণত বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের নিবিড় মমতায় গাইড করুন।

বিশ্বাস ও মমতায় ঘেরা বন্ধন

মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। সন্তানের যদি মা-বাবার ওপর বিশ্বাস না থাকে, তবে সে তার মনোভাব, ভালোলাগা, আগ্রহ, কৌতূহল ও পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো তাদের সাথে আলোচনা করে না। ফলে মা-বাবা তার নিজের সন্তানকেই বুঝতে পারে না; বরং তাদের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও মমতায় ঘেরা। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিশ্বাসের জন্ম দেয়, সুখে-দুঃখে একসঙ্গে থাকার শক্তি জোগায়, মনের কথা বলতে উৎসাহ দেয় এবং এই সম্পর্কের ফলে একজন আরেকজনের উপস্থিতিকে উপভোগ করে। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা মিথ্যা বলে নিজেকে লুকাতে চায়। এর কারণ হলো, তারা জানে সত্য বলা তার জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে। সচেতন মা-বাবার উচিত, বাচ্চাদের সংশোধনের স্বাভাবিক সুযোগ দেওয়া; যেন তারা নিজেদের শুধরে নেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়।

চাকরিজীবী মা-বাবার বাড়তি কাজ

যে পরিবারে মা-বাবা দুজনই চাকরি করেন, তাদের উচিত দিনে দু-তিনবার কাজের ফাঁকে সন্তানদের সাথে কথা বলা। ভারী কথাবার্তা নয়; বরং তাদের খোঁজখবর নেওয়া। বন্ধুরা কারা স্কুলে আসলো, সব ক্লাস হয়েছে কি না বা আজ টিফিনে কী খেয়েছে ইত্যাদি। এতে বাচ্চাদের জড়তা কাটবে এবং বন্ধুবৎসল হবে। মনে রাখবেন, ডে-কেয়ার মা-বাবার সান্নিধ্যের বিকল্প নয়।

খাবার টেবিলের আলাপচারিতা

খুব ব্যস্ততার মাঝেও দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় সন্তানদের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। সকালের নাস্তা বা রাতের খাবারের সময় এ ধরনের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। খাবারের সময় আমরা বলতে পারি, এত সুস্বাদু খাবার আমাদের সামনে, আমরা দুনিয়ায় একই পারিবারিক বন্ধনে মায়া-মমতায় আবদ্ধ। আমরা তো চাই বেহেশতেও এভাবে থাকতে। যদি আমাদের লক্ষ্য হয় জান্নাত, তবে আমাদের সকলেরই উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। এ ধরনের হালকা কথাবার্তায় একদিকে খাওয়ার পরিবেশও ঠিক রাখবে, অন্যদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে।

পরামর্শ ও মতামতের গুরুত্ব দিন

সন্তানরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। একদিন আমাদের জায়গাগুলো তাদের মাধ্যমে পূরণ হবে। আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের জায়গাগুলো তাদের দ্বারা শোভিত হবে, তাদের দায়িত্বশীলতায় পরিবার ওসমাজের বিকাশ হবে- এগুলোই তো আমাদের চাওয়া। এই স্বপ্নপূরণে সন্তানের প্রস্তুতির সময় তো এখনই। প্রত্যেক মা-বাবা প্রতিদিন পারিবারিক নানা বিষয়ের মুখোমুখি হন,

যেগুলোর সমাধানে সন্তানদের আমরা পাশে রাখতে পারি। তাদের মতামতও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এতে তারা দায়িত্বশীল হতে শিখবে। তবে এ ধরণের আলোচনা যেন ভারী না হয়ে উঠে, সে দিকেও খেয়াল রাখা উচিত।

বড়ো স্বপ্ন দেখা

বড়ো হতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এপিজে, আবদুল কালাম বলেন–

'স্বপ্ন তা নয়, যা আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি; বরং তাই স্বপ্ন যা আমাদের ঘুমোতে দেয় না।'

আধুনিক মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাহাথির মোহাম্মদ তাঁর সাফল্যের রহস্য ব্যাখ্যা করে বলেন 'Seeing the big picture and planning for future'। ২০১৭ সাল আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সংকল্প' কবিতার শতবর্ষপূর্তি ছিল। এই কবিতার একটি ছাত্র 'বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় ভরে।' যোগাযোগ প্রযুক্তির আকাশচুম্বী উৎকর্ষতায় শতবর্ষ আগে কবির এই আকাঙ্ক্ষা আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

শৈশব থেকেই যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি করা যায় এবং এর সাথে শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বশীলতা সংযুক্ত থাকে, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হতে পারে। আমরা শুধু চেষ্টার সবটুকু উজাড় করে লেগে থাকতে পারি। সাফল্য আল্লাহর হাতে।

শ্রদ্ধাপূর্ণ মতামত

সমাজের অনেকের মতামত আমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। গঠনমূলক সমালোচনা আমরা করতেই পারি। মনে রাখতে হবে যেন এসব সমালোচনা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সমাজে অসুস্থ প্রতিযোগিতা কমতে পারে। বাচ্চারা গভীর অভিনিবেশ সহকারে মা-বাবার আচরণ আত্মস্থ করে। কাজেই কারও সম্পর্কে কথা বলার ক্ষেত্রে মা-বাবার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; যেন বাচ্চাদের মণিকোঠায় কারও সম্পর্কে অহেতুক নেতিবাচকতা জায়গা করতে না পারে।

খাবারের আদব

খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলুন। বসে খাবার নিন। ডান হাতে খান। রাসূল সা. বলেছেন– 'শয়তান বাম হাতে খায়।' খাবারের মাঝখানে বরকত নাজিল হয়। এর জন্য এক পাশ থেকে খাবার শুরু করতে বলেছেন। অপর পাশ থেকে খাবার শুরু করতে নিষেধ করেছেন। পানি তিনবারে পান করতে বলেছেন। যেকোনো ধরনের অপচয়কে এড়িয়ে চলতে হবে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

'তোমরা খাও, পান করো, অপচয় করো না।'[২৪]

---

[২৪]. সুরা বানি ইসরাইল, আয়াত-২৭।

সালাম দিন সবার আগে

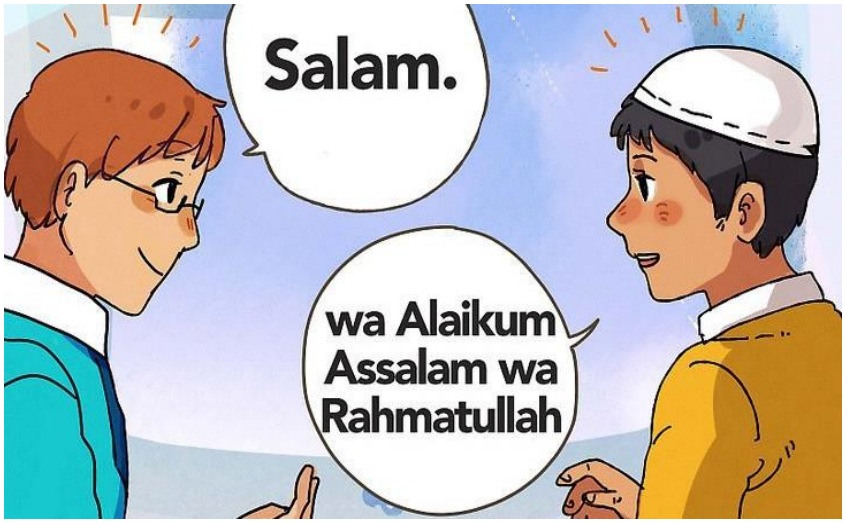

পরিবারের সদস্যদের সালাম দিন। বারবার দিন। রাসূল সা.বলেন-

'তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও।'[২৫]

এক গাছ থেকে আড়াল হলে তাকে আবার সালাম দাও। আমরা নিজেরা সালামের চর্চা করলে সমাজে ভাতৃত্বের অভাব অনেকাংশে কমে যেতে পারে। সালাম মানে কি! অন্যের জন্য শান্তি, রহমত ও বরকত কামনা করা। সমাজে একে অপরের প্রশান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করলে সে সমাজে কেউ ভ্রাতৃঘাতী হতে পারে না।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন

আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করুন। ভোগবাদের দাসে পরিণত হলে পরিবারে কলহ-বিবাদ, বিপর্যয়, পারস্পরিক অবিশ্বাস সংঘাত লেগেই থাকে; যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর। কৃপণতাও ঠিক নয়, তবে খরচে মধ্যম পন্থা সবচেয়ে ভালো। মানুষ নিজ পরিবারের জন্য সওয়াবের আশায় যা ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সাদকাহ।[২৬]

গৃহকর্মীর প্রতি মানবিক আচরণ

গৃহকর্মীর প্রতি আচরণ অনেক ক্ষেত্রে দাসসুলভ। পারিবারিক গণ্ডির ভেতর যদি আমরা মানবিক বোধ, সম্ভ্রম, মর্যাদা নিশ্চিত করতে না পারি, তবে এত উন্নতি, এত লেখাপড়া শিখে কী লাভ? বাসায় অনেক সিনিয়র কর্মীকেও খুব অশালীনভাবে সম্বোধন করি। বকাঝকা তো লেগেই থাকে। অপেক্ষাকৃত কম অবস্থাসম্পন্ন লোকদের প্রতি দরদি আচরণ পরিবার থেকেই শেখাতে হবে। নইলে পাঁচ-দশ টাকা বেশি দাবি করলে রিক্সাওয়ালার গায়ে হাত তোলার দৃশ্য চোখে পড়ত না।

---

২৫. সহিহ মুসলিম-৮১।

২৬. সহিহ বুখারি।

বাচ্চাদের বুঝতে দিন, তারা কত সৌভাগ্যবান যে অন্য অনেক পথশিশুর মতো তাদের আয় করে জীবন চালাতে হয় না। বুঝতে দিন, কাউকে বেশি দিতে পারাও তৃপ্তির কারণ এবং আনন্দের বিষয় হতে পারে। পার্থক্য শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। পত্র-পত্রিকায় গৃহকর্মী নির্যাতনের এমন অনেক খবর চোখে পড়ে, যা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। মানুষ কীভাবে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে? বোঝাই যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করলেই, লেখাপড়া শিখলেই মানুষ হওয়া যায় না। ভেতরকে সুন্দর করতে না পারলে, বাহ্যিক চাকচিক্য কোনো কাজে লাগে না। গুণীজনরা বলেন-

'ধন থাকলে ধনী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।'

আসলে শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, জীবনের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে মানবিকতার পরিচয় দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষার প্রতিফলন।

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

নারী-পুরুষ মিলেই একটা সমাজ নির্মিত হয়। তারা একে অপরের সহপাঠী হতে পারে। কাজের সুবাদে সহকর্মী হতে পারে, কখনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে সহযাত্রী হয় বা কোনো অনুষ্ঠানে একে অপরের আমন্ত্রিত অতিথি হয়। এই সম্পর্কগুলো ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক। এ ধরনের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধসহ সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠিত সীমার বাইরে এই সম্পর্কগুলো টেনে নেওয়া উচিত নয়। এতে পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে এবং প্রিয়জনদের মধ্যে আস্থার সংকট সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, নাটক, সিনেমা বা বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের বোধ-বিশ্বাসের সাথে যায় না। অনেকক্ষেত্রেই নারী চরিত্রের উপস্থিতি আপত্তিকর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও মনে হয় যে, নারী কোনো মানুষ নয়; পণ্য বিশেষ। এর ফলে সমাজও প্রভাবিত হয় এবং নারীর প্রতি একপেশে মনোদৃষ্টি তৈরি করে। সন্তানদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে না পারলে সামাজিক অনাচার ও বিকৃতি সমাজকে ধ্বংসের শেষ প্রান্ত সীমায় নিয়ে যাবে। এজন্য মা-বাবার উচিত সম্পর্কভেদে সন্তানদের আচরণ লক্ষ করা এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা, যেন তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে শেখে।

সন্তান প্রতিপালনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

‘তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের অধীনস্থ ব্যক্তি ও সম্পদের দায়িত্বশীল।’ **মহানবি সা.**

বহুমাত্রিক সমাজে সন্তানের বেড়ে ওঠায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থাকে। সব প্রভাব-ই ইতবাচক নয়। প্রশ্ন হলো নেতিবাচকতা থেকে সন্তানদের আগলে রাখার উপায় কী? সরল উত্তর হলো সচেতনতা বাড়ানো এবং নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিজেদের করণীয় সম্পর্কে প্রস্তুতি থাকা। সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো সবসময় ইতিবাচক বিষয় খুঁজে বেড়ানো এবং যতটা সম্ভব সন্তানদের এর মাঝে ব্যস্ত রাখা। নেতিবাচক বিষয়ের কোনো বিকল্প না রেখে শুধু সময়ের হাতে ছেড়ে দিলে বিপদ বাড়তে পারে।

ধর্মীয় উৎসবে স্পর্শকাতরতা

ধর্ম যার, উৎসবও তার– এটাই নির্মোহ যুক্তি। একজনের ধর্মীয় আচরণকে অন্যের উৎসবে পরিণত করতে গেলে জগাখিচুড়ি হয়ে আকবরের ‘দ্বীনে ইলাহি’-তে পরিণত হতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক না হলে বড়ো ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালনের সুযোগ রয়েছে। সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেককে তার পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা, সুযোগ করে দেওয়া। এর অর্থ এই নয় যে,

একে অপরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সংহতি প্রকাশ করতে হবে। এমন কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া উচিত নয়, যা বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন, ব্যতিক্রম হলো শিরকের গুনাহ।

ভ্যালেন্টাইনস ডে

কোনো বিশেষ দিবস ঠিক করে ভালোবাসতে হবে কেন? এটা সত্যিকারের ভালোবাসার সাথে এক ধরনের ঠাট্টা করার শামিল। ভালোবাসার আবেদন অনেক গভীর, ব্যাপক, সম্পর্কভেদে বহুমাত্রিক ও সর্বজনীন। একে কোনো যুগলের প্রেমলীলার বিষয় বানানো উচিত কাজ নয়। এ ধরনের সামাজিক অনাচার থেকে রক্ষা পেতে হলে সন্তানদের কাছে ভালোবাসার গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে। ভালোবাসাই জীবন এই বোধ-বিশ্বাস সবসময় লালন করতে হবে। হৃদয়হীনতা থাকলে, নিষ্ঠুরতার প্রাধান্য থাকলে সভ্যতা অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত।

ইন্টারনেটের বিপদজনক ফাঁদ

স্মার্টফোনের সুবাদে ইন্টারনেট এখন সুলভ ও জনপ্রিয়। ইন্টারনেট সচেতন ও শিক্ষিতজনের নিত্য সঙ্গী হতেই পারে। তা ছাড়া পড়াশোনায় ইন্টারনেটের ব্যবহার যুগান্তকারী। তবে শিশুদের হাতে এই প্রযুক্তি তুলে দেওয়া যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। শিশুদের শৈশব কেড়ে নিয়ে তাদের হাতে একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জগৎ তুলে দিয়ে আমরা বরং তাদের ঠেলে দিচ্ছি একটা বিপজ্জনক ফাঁদে। এর সাথে যোগ হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের বাড়াবাড়ি রকমের অপব্যবহার। যদি একটা শিশু ফেসবুকে সারাক্ষণ ডুবে থাকে এই আশায় যে, নিজের ছবি কিংবা তার সারাদিনের কর্মকাণ্ডের বর্ণনায় অসংখ্য মানুষের 'লাইক' পাওয়াই হচ্ছে জীবনের একমাত্র বিনোদন, তাহলে কি সে সঠিক মানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে? তবে ইন্টারনেটের কিছু নিয়ন্ত্রিত ও গাইডেড ব্যবহার হতে পারে, যার মাধ্যমে আপনি বাচ্চাদের উপযোগী ভালো কিছু বিষয়ও শেখাতে পারেন।

ঘর হোক সাংস্কৃতিক চেতনার বাতিঘর

সাংস্কৃতিক বিকৃতির প্রাথমিক বাহন রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন, সংগীত, ফ্যাশন শো, মেলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য, স্মরণোৎসব ইত্যাদি। ভারতীয় এমন কোনো সিরিয়াল নেই, যেখানে তাদের ধর্মীয় আচার দেখানো হয় না। অথচ, আমাদের এখানকার সিরিয়ালগুলো পরিবার-পরিজন নিয়ে দেখার রুচি থাকে না। অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত কোনো নাটক-সিনেমা তৈরি হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিষয়াদি বিকৃত করে তুলে ধরা হয়।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে আমাদের একটি নৈতিক ছাঁকুনি নির্মাণ করতে হবে; যা দিয়ে আমরা বুঝব কী কী বিষয় আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যবিরোধী। বিশুদ্ধ পানি পেতে আমরা ছাঁকুনি ব্যবহার করি। পানির ফিল্টার ময়লা

বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ আটকে দেয় এবং আমরা সুপেয় পানি পাই। আমরা এটা করি এজন্য যে, আমাদের দেহ যেন সুস্থ থাকে। আমাদের মানসিক সুস্থতার জন্য, বোধ-বিশ্বাস সংরক্ষণের জন্যও দরকার এক ধরনের নৈতিক ছাঁকুনি। এ ছাঁকুনি আমাদের সতর্কতার সাথে অশ্লীল ও মন্দকাজ ত্যাগ করতে সাহায্য করবে।

সামাজিক বিবর্তন ও বিকৃতি

সমাজে বিশেষ উপসর্গ ভিন্ন ধর্মবালম্বীর সাথে বিয়ে। পারিবারিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়লে সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয়। এগুলো ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষার কুফল। এক ধর্মের ছেলেমেয়ের সাথে অন্য ধর্মের ছেলেমেয়ের বিয়ে হচ্ছে, ধর্ম এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। সমাজও অনেক ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে নীরব। তাদের সন্তানদের ধর্মের ভিত্তিতে পরিচয়ের সমস্যা তৈরি হয়। শক্ত পারিবারিক বন্ধনই পারে এসবের বিপরীতে অবস্থান তৈরিতে। এ ছাড়া সমাজে নতুন অনাচারের সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে সমকামিতা। পশ্চিমা সভ্যতায় ভেতর থেকে পচন ধরেছে। বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় আমাদের দেশের মতো রক্ষণশীল সমাজেও সংখ্যায় অল্প হলেও বিকৃত রুচির সরব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। এটা লিভ টুগেদারের পরের ধাপ। কখন কে, কোন ফাঁদে পড়ছে সে আশঙ্কায় না থেকে ঘর থেকেই সচেতন হন। বাচ্চাদের সাথে গভীর বন্ধুবৎসল সম্পর্ক গড়ে তুলুন। বোঝানোর চেষ্টা করুন 'Self defence is the best defence.'

মেয়েদের সম্মান দিন, যত্ন নিন

সাধারণত ২০-২২ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা মা-বাবার সাথে থাকে। বিয়ে হয়ে গেলে স্থায়ীভাবে আরেকটা ভিন্ন পরিবেশে চলে যায়। এই সময়টা তাদের প্রতি আবেগ ভালোবাসা সবটুকু উজাড় করে দিন। পরবর্তী সময়ে মেয়েরা যখন বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে, মেহমান হিসেবেই আসে। অনেকেই ছেলে সন্তানের বাড়তি গুরুত্ব দেন। লিঙ্গের ভিত্তিতে সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি।

> 'আল্লাহ যাকে চান কন্যাসন্তান দেন, কাউকে দেন শুধু ছেলে, যাকে খুশি উভয়ই দেন, আর যাকে ইচ্ছা কিছুই দেন না; তিনি সর্বজ্ঞানী ও অসীম ক্ষমতার আধার।'[২৭]

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে কত মাকে যে শ্বশুরবাড়িতে মানসিক নিপীড়নের মধ্যে পড়তে হয়, তার হিসেব নেই। অথচ বায়োলজিক্যালি শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, যেকেউ হতে পারে আপনার জন্য প্রশান্তির কারণ। একটা মেয়ে যখন দেখে, তার চাইতে তার ভাইদের গুরুত্ব পরিবারে বেশি, তখন তার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। সে হয়তো তা প্রকাশ্যে বলে না, কেননা এতে মা-বাবা আরও রুষ্ট হতে পারেন।

---

[২৭]. সূরাহ আস শুরা ৪২, আয়াত ৪৯-৫০।

এ ধরনের বৈষম্য বা বঞ্চনা সমাজে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করে অনেককে বিপথগামী করে। রাসূল সা. কোনো সফরে বের হলে সবার শেষে আর সফর থেকে ফিরে সবার আগে দেখা করতেন হজরত ফাতিমা রা.-এর সাথে। তিন বা দুই মেয়ের মাতা-পিতার জন্য তিনি দিয়েছেন বেহেশতের সুসংবাদ।

মেয়েদের পাওনা পরিশোধে গড়িমসি

আমাদের সমাজে কেউ মারা যাওয়ার পর সবচেয়ে স্পর্শকাতরতার মধ্যে পড়েন বাড়ির মেয়েরা। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উত্তরাধিকার পাওনা ঠিকমতো পরিশোধ করা হয় না বা শঠতার আশ্রয় নেওয়া হয়। মেয়েদের এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, এগুলো চাওয়াও যেন রীতিমতো অপরাধতুল্য। অথচ এই পাওনা আল্লাহর দেওয়া হক। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, আবার এমন চিত্রও রয়েছে যদিও বা কেউ ফারায়েজ পরিশোধ করেন, তা করেন নিতান্ত লোক-লজ্জার ভয়ে। তাদের ভাগে জোটে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সহায় সম্পদ। এটা যে কত বঞ্চনার তা কি কেউ ভেবে দেখেন? সমালোচকরা এই সুযোগটাই নেন। জানাশোনা না থাকলে এমন অভিযোগও গিলতে হয় যে, মেয়েদের ভাগ ছেলেদের চেয়ে কম, যদিও বাস্তবতা ভিন্ন।

সন্তান পালন সাধনার বিষয়

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের জাহান্নামের আগুন থেবে বাঁচাও।’ **সূরা আত-তাহরিম, ৬**

দুনিয়ার সহায়-সম্পদ রক্ষার জন্য আমাদের কত ব্যস্ততা, কত আয়োজন! বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী থাকে, নিরাপত্তা দেওয়াল আছে, কোথাও আছে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা। ক্ষেত্র বিশেষে গৃহাভ্যন্তরেও থাকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনি। লকার, ভল্ট তো থাকেই। সন্তান-সন্ততির নেয়ামতরূপী যে সম্পদ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, তার সঠিক শুকরিয়া আদায় ও পরিচর্যায় আমরা অনেকেই বেখেয়াল। দুনিয়ার বৈষয়িক সম্পদ খোয়া গেলে তা পুষিয়ে নেওয়ার নানা সুযোগ আসতে পারে, সন্তান-সন্ততি নষ্ট হয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়া বেশ কঠিন। সম্প্রতি পুলিশ কর্মকর্তা স্ত্রীসহ সন্তানের হাতে জীবন হারানোর ঘটনা পত্র-পত্রিকায় আলোচিত বিষয়। কেবল মা-বাবা হতে পারাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন নিবিড় যত্ন ও সাধনা।

প্যারেন্টিংও শেখার বিষয়

পেশাদার হতে চাইলে আপনাকে সংশ্লিষ্ট পেশায় পারদর্শী হতে হয়, নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়। প্যারেন্টিং এমন একটা বিষয়, যেখানে আমরা মনে করি আমাদের শেখার প্রয়োজন নেই বা পারদর্শিতার কিছু নেই। সন্তান জন্মদানকে আমরা শুধু প্রাকৃতিক বিষয় মনে করি। মনে রাখতে হবে, আপনি যে পেশায় কাজ করেন, সেখানে আপনার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সব উজাড় করে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেন, যেন আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন। প্যারেন্টিং তার চাইতেও

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্য। আপনি একজন মা-বাবা হিসেইে নয়; বরং একজন সম্মানিত মানুষের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। আল্লাহ বলেন–

'আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি।'[২৮]

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। কাজেই এ ধরনের সম্মানিত প্রতিনিধির প্রতি দায়িত্ব পালনে জীবনব্যাপী সাধনায় আমাদের কোনো জানাশোনা থাকবে না, প্রস্তুতি থাকবে না, এটা হতে পারে না। তবে এটা ঠিক, উন্নত বিশ্বে প্যারেন্টিং বিষয়ে শেখার বা পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও আমাদের দেশে তা অত্যন্ত সীমিত। নিতান্ত বিপদগ্রস্ত না হলে আমরা কোনো পরামর্শকের দ্বারস্থ হই না। সফল মা-বাবা হওয়ার জন্য মা-বাবাকে অনেক দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। সফল যোগ্য সন্তানের জন্য চাই যোগ্য-দক্ষ মা-বাবা। আর অনুশীলন করেই এই দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।

সন্তানদের জন্য দুআ করুন

সন্তান লালন-পালনে আপনার সচেতন প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তাদের জন্য নিয়মিত দুআ করা। সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার গুরুত্ব এত বেশি যে কুরআনের কয়েক স্থানেই সন্তানদের জন্য মাতা-পিতার দুআর বিবরণ এসেছে। সন্তানরা অনেক সময় ভুল করে, কষ্ট দেয়। এগুলো ধরে না রেখে তাদের জন্য সবসময় কল্যাণ কামনা করতে আমাদের ক্লান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ লাভ করার আশা করতে পারি!

গুড প্যারেন্টিং মোনাজাত

হে আল্লাহ,
আমাদের সন্তানদের আমাদের জন্য চোখ জুড়ানো বানিয়ে দিন,
তাদের দীর্ঘ হায়াত দিন,
সুস্থতার নেয়ামত দিন,
উন্নত চরিত্রের আধার বানিয়ে দিন,
কল্যাণকর কাজ করার তাওফিক দিন,
তাদের অভাবমুক্ত রাখুন,
হে প্রভু, তাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন এবং তাদের ক্ষমা করুন।

আমিন।

---

[২৮]. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত- ৭০।